নিউজলেটার

কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস ঢাকা-এর বুলেটিন

৪২তম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা
অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২০ ইং
সফর-জমাদিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরি

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি
ড. সাইয়্যেদ হাসান সেহাত

সম্পাদনা পরিষদের সদস্য
নূর হোসেন মজিদী
আবদুল মুকীত চৌধুরী
ড. সাইয়্যেদ হাসান সেহাত
ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী
মোহাম্মদ আশিফুর রহমান
মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম

نیوزلتر بزرگسالان
نشریه رایزنی فرهنگی سفارت ج. ا. ایران در داکا
سال ۴۲، شماره ۳، اکتبر - دسامبر ۲۰۲۰
مهر-آبان-آذر ۱۳۹۹

مدیر مسؤول وسردبیر :
دکتر سید حسن صحت
رایزن فرهنگی
سفارت جمهوری اسلامی ایران در داکا

اعضای هیئت تحریریه :
نور حسین مجیدی
عبد المقیت چودری
دکتر سید حسن صحت
دکتر محمد عیسی شاهدی
محمد آصف الرحمن
محمد سعید الاسلام

মুদ্রণ : মাল্টি লিংক প্রিন্টার্স
৬৮, ফকিরাপুল, ইসলাম ভবন (২য় তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৭১৯১৮১৮, E-mail : multilinkp@gmail.com

''যতদিন পর্যন্ত না 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' ধ্বনি সমগ্র পৃথিবীতে ধ্বনিত হবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে। পৃথিবীর যেখানেই জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের সংগ্রাম সেখানেই আমরা আছি।'' -ইমাম খোমেইনী (রহ.)

সূচিপত্র

- স্মরণীয় বাণী ▸▸ ০২
- সম্পাদকীয় ▸▸ ০৩
- আদর্শ ▸▸ ৪-২৪
  - কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে মানবতার ঐক্য ও ইসলামি ঐক্য ▸▸ ০৪-০৭
  - আত্মগঠন ও মানবীয় গুণাবলি অর্জনে ইমাম হাসান (আ.)-এর কর্মপন্থা ▸▸ ০৮-১১
  - আরবাইন : ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শাহাদাতের স্মরণ ▸▸ ১২-১৩
  - ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর জীবন ও কর্ম ▸▸ ১৪-১৮
  - ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবনের তাৎপর্য ▸▸ ১৯-২২
  - ইসলামে নারী অধিকারের স্বরূপ ▸▸ ২৩-২৪
- ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান ▸▸ ২৫-৩৩
  - জেনারেল সোলাইমানি : অন্তহীন এক বীরের স্মৃতিকথা ▸▸ ২৫-২৮
  - পরমাণুবিজ্ঞানী ফাখরিজাদে হত্যাকাণ্ড ইতিহাসের এক কালো অধ্যায় ▸▸ ২৯-৩১
  - শাবে ইয়ালদা ঐতিহ্যবাহী ইরানি উৎসব ▸▸ ৩২-৩৩
- সাহিত্য ▸▸ ৩৪-৪৩
  - সুবর্ণজয়ন্তীর দ্বারপ্রান্তে আমরা : এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ▸▸ ৩৪-৩৭
  - মহাকবি হাফিজের কাব্যে পবিত্র কুরআনের প্রতিফলন ▸▸ ৩৮-৪১
  - বাংলাদেশে ফারসি শিক্ষায় করোনা মহামারির প্রভাব ▸▸ ৪২
  - ইরানি প্রবাদ বাক্য ▸▸ ৪৩
  - বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের ব্যবহার ▸▸ ৪৩
- স্মরণীয় দিবস ▸▸ ৪৪
- সংবাদ (বিদেশী সংবাদ) ▸▸ ৪৫-৫৩

কিশোর নিউজলেটার সূচিপত্র

- মহান আল্লাহর পরিচয় ▸▸ ৫৪
- আশা পূরণের গাছ : পূজা রহস্য ▸▸ ৫৫-৫৭
- মহানবী (সা.)-এর দয়া ও অনুগ্রহ ▸▸ ৫৮-৫৯
- যে বিড়াল ইঁদুর ধরতে পারে না ▸▸ ৫৯
- ছড়া কবিতা ▸▸ ৬০

কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা
বাড়ি নং-১৭, রোড নং-৪, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫। ফোন : ৯৬১১৮৬৪, ৯৬১১৯৮৭
E-mail : dhaka.icro@gmail.com

স্মরণীয় বাণী

- এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এলো এবং বলল : 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে নসীহত্ করুন।' রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে তিনবার জিজ্ঞেস করলেন : 'আমি যদি তোমাকে নসিহত্ করি তা মেনে চলবে তো?' লোকটি তিনবারই জবাব দিল: 'জ্বী, হে আল্লাহ্র রাসূল!' তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করলেন : তোমাকে নসিহত করছি যে, যখনই তুমি কোনো কাজ আঞ্জাম দেয়ার সিদ্ধান্ত নেবে তখনি কাজটির পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তা ও পর্যালোচনা করবে; কাজটা যদি উন্নতি ও হেদায়াতের উৎস হয়ে থাকে তাহলে তা আঞ্জাম দাও, আর তা যদি গোমরাহীর উৎস হয়ে থাকে তাহলে তা বর্জন করো।'
- রাসূলে আকরাম (সা.) এরশাদ করেন : 'যে কেউ কিছু জ্ঞান শিক্ষা করল এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তা লোকদেরকে শিক্ষা দিল আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সত্তর জন নবীর পুরস্কারের সমতুল্য পুরস্কার প্রদান করবেন।'
- হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) এরশাদ করেন : 'পিতার ওপর কন্যার অধিকার হচ্ছে এই যে, তাকে সূরা আন্-নূর শিক্ষা দেবে।'
- হযরত রাসূলে আকরাম এরশাদ করেন : : 'তোমার মেহমানকে এমন কিছু করতে বাধ্য করো না যা সম্পাদন করা তার জন্য কঠিন।'
- স্বীয় পুত্র মুহাম্মাদ বিন হানাফীয়ার উদ্দেশে কৃত অসিয়তে ইমাম আলী (আ.) এরশাদ করেন : 'যে কেউ স্বীয় কাজের পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা না করে কোনো কাজে হাত দেয় সে নিজেকে অত্যন্ত নোংরা ও অপছন্দনীয় ঘটনাবলির মুখোমুখি করে। আর কাজের আগে চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনা তোমাকে লজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে।'
- আমীরুল্ মু'মিনীন্ হযরত আলী (আ.) এরশাদ করেন : 'তোষামোদ ও ঈর্ষা মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য নয়, তবে জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে হলে তা ব্যতিক্রম।'
- হযরত আলী (আ.) এরশাদ করেন : 'নাফ্সের পবিত্রতাসহ কোনো পেশায় নিয়োজিত থাকা অপবিত্রতা মিশ্রিত ধন-সম্পদের তুলনায় উত্তম।'
- হযরত ইমাম সাজ্জাদ্ (আ.) এরশাদ করেন : 'তোমার পিতার অধিকার হচ্ছে এই যে, তুমি মনে রাখবে, সে হচ্ছে তোমার মূল আর তুমি হচ্ছ তার শাখা এবং মনে রাখবে, সে না হলে তোমারও অস্তিত্ব হতো না। অতএব, যখনই তোমার নিজের মধ্যে এমন কোনো নে'আমত পাবে যা তোমাকে আনন্দিত করে তখন মনে করবে যে, তোমার পিতাই তোমার এ নে'আমতের মূল। তাই আল্লাহ্র প্রশংসা করো এবং ঐ নে'আমতের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।'
- হযরত ইমাম বাকের (আ.) এরশাদ করেন : হযরত মূসা (আ.) একদিন আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত করার সময় এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্র 'আরশের ছায়াতলে দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : 'হে আমার রব! এই ব্যক্তি কে, যে, তোমার 'আরশ তার ওপরে ছায়া ফেলেছে?' আল্লাহ্ বললেন : 'এ হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে তার পিতা ও মাতার কল্যাণ করেছে এবং সে চোগলখুরি করে নি।'
- হযরত ইমাম বাকের (আ.) এরশাদ করেন : 'কেউ যদি পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের উভয়ের প্রতি কল্যাণ সাধন করে থাকে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর তাদের ঋণ পরিশোধ না করে এবং তাদের জন্য ইস্তিগফার্ না করে, আল্লাহ্ তাকে পিতামাতার অবাধ্য হিসেবে গণ্য করবেন।'
- হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক (আ.) তাঁর সন্তানদের কয়েক জনের উদ্দেশে এরশাদ করেন : 'আলসেমি ও অধৈর্য (অস্থিরতা) এই দু'টি স্বভাব পরিহার করো। কারণ, এ দু'টি তোমার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।'
- আবূ 'আম্র্ শায়বানী বলেন : হযরত ইমাম সাদেক (আ.)-কে দেখলাম একটি কাপড় গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বেলচা হাতে তাঁর বাগানে কাজ করছেন এবং তাঁর শরীর থেকে ঘাম বেয়ে পড়ছে। আরয করলাম : 'আপনার জন্য উৎসর্গ হই! বেলচাটা আমাকে দিন; আপনার পরিবর্তে আমি কাজ করব।' তিনি এরশাদ করলেন : 'আমি পছন্দ করি যে, ব্যক্তি কষ্টদায়ক রোদের গরমে স্বীয় যিন্দেগীর প্রয়োজন পূরণের জন্য কষ্ট করবে।'
- হযরত ইমাম মূসা কাযেম্ (আ.) এরশাদ করেন : 'পাকস্থলী হচ্ছে রোগব্যাধিসমূহের গৃহ ও কেন্দ্র।'
- হযরত ইমাম রেযা (আ.) এরশাদ করেন : 'আল্লাহ্ তাকওয়ায়ে ইলাহীকে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজখবর নেয়ার সাথে একত্রে উল্লেখ করেছেন। অতএব, যে কেউ আত্মীয়-স্বজনের খোঁজখবর নেয় না সে তাকওয়ায়ে ইলাহীর অধিকারী নয়।'

(মাফাতীহুল্ হায়াত্ গ্রন্থ থেকে সংকলিত)
অনুবাদ : নূর হোসেন মজিদী

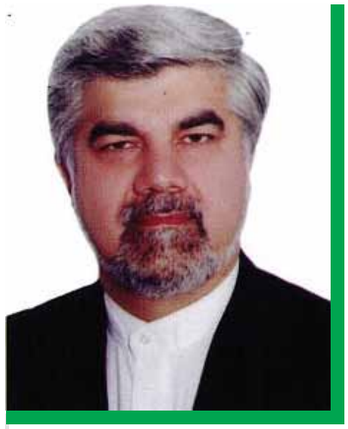

সম্পাদকীয়

হাজি কাসেম সোলাইমানির শাহাদাত বার্ষিকী ও বিশ্ব প্রতিরোধদিবস

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

আমরা বিশ্বের মজলুম ও নিপীড়িতদের জন্য নিবেদিত, সাহসী ও আত্মত্যাগী অনন্য সেনানায়ক জেনারেল কাসেম সোলাইমানির কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের এক বছর পূর্তির (৩ জানুয়ারি) দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি– যিনি ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষায় এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং অবশেষে সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকদের হাতে শাহাদাত বরণ করেছেন।

বিশ্ববাসী সাক্ষী যে, জেনারেল কাসেম সোলাইমানি আইএস-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মূলোৎপাটনের জন্য তাঁর সারাটা জীবন ব্যয় করেছেন। মুসলিম দেশ ইরাক ও সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল – যা দখল করে আইএস ঐ দেশ দু'টিকে তাদের তথাকথিত ইসলামি সরকারের ভূমি বলে ঘোষণা করেছিল – তিনি শাহাদাতের সুধা পান না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

জেনারেল সোলাইমানি এমন এক সময় ইরাকে ইসলামি ঐক্যের দুশমনদের হামলার শিকার হন যখন তিনি ইরাকের প্রধানমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণে ইরাক সরকারের মেহমান হিসেবে বাগদাদে গিয়েছিলেন। কিন্তু বলদর্পী মার্কিন সরকারের নীতি হচ্ছে তাদের প্রতিপক্ষের লোকদেরকে যেখানে ও যেভাবে সম্ভব হত্যা করা; এ ক্ষেত্রে তাদের কাছে না মেহমানের মর্যাদা আছে, না কোনো দেশের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের মর্যাদা আছে, না আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি তাদের কোন শ্রদ্ধাবোধ আছে।

গোটা দুনিয়া প্রত্যক্ষ করেছে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদেরকে কী রকম নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। সে সব বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী কেবল ইরানি জাতির সম্পদ ছিলেন না, বরং তাঁরা ছিলেন সমগ্র ইসলামী বিশ্বের সম্পদ। কিছুদিন পর পরই তাঁদের একেক জন ইরানের মুসলিম জাতির ও ইসলামের শত্রুদের হাতে হামলার শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করছেন। তাদের সর্বশেষ ও সর্বসাম্প্রতিক কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ইরানের শীর্ষ পরমাণুবিজ্ঞানী ও দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গবেষণা ও উদ্ভাবন বিষয়ক সংস্থার চেয়ারম্যান ড. মোহসেন ফাখরিজাদে। আমরা এখন এই প্রিয় শহীদের শাহাদাতের চেহ্লামের সময় অতিক্রম করছি।

কিন্তু যারা একটি জাতির বিজ্ঞানীদের হত্যা করে তাদের আসল উদ্দেশ্য কী? কেন তারা চিন্তার স্বাধীনতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ-বিস্তারের বিরোধী? কেন তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের মোকাবিলায় অস্ত্র ব্যবহার করে?! কেন চিন্তা ও কলমের মোকাবিলায় অস্ত্র ব্যবহার করে? আর কেনই বা তারা মুসলিম দেশগুলোর বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে? তাদের লক্ষ্য কি মুসলিম উম্মাহ্কে ও মুসলিম দেশগুলোকে দুর্বল ও অক্ষম করা ছাড়া আর কিছু?

প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামের শত্রুদের এ দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে মসলিম উম্মাহ্ ও ইসলামি দেশগুলোর কর্তব্য কী? ইসলামী উম্মাহ্ ও মুসলিম বিশ্বের ঐক্য এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় প্রতিরোধের কৌশল অবলম্বনই কি এই ইসলামবিরোধী ও জ্ঞানবিজ্ঞানবিরোধী স্রোতকে মোকাবিলা করার সেরা কর্মকৌশল নয়?

আমরা ইসলামের ইতিহাসের শুরু থেকে এ পর্যন্তকার সকল শহীদের বিদেহী নাফ্সের প্রতি, বিশেষত ইসলামি ইরানের সকল শহীদ, আরো বিশেষ করে জেনারেল কাসেম সোলাইমানি ও তাঁর শহীদ সঙ্গীদের এবং শহীদ ফাখরিজাদে ও অন্যান্য শহীদ বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীর মহান বিদেহী নাফ্সের প্রতি–যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদের পথে শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন–সালাম পৌঁছে দিচ্ছি।

আমরা একই সাথে সালাম পৌঁছে দিচ্ছি ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর মহান ও পবিত্র বিদেহী নাফ্সের প্রতি– যাঁর চিন্তাদর্শে ও পবিত্র প্রতিরক্ষাকালীন সময়ে এমন সাহসী ও নির্ভীক সন্তানরা গড়ে উঠেছিলেন এবং যাঁর বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্ব ও হেদায়াতের ছায়ায় ইসলামি বিপ্লবের বর্তমান নেতা হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী এমন বিচক্ষণ দিকনির্দেশনার মাধ্যমে ইসলামের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সমুন্নত রেখে বলদর্পিতাবিরোধী কর্মকৌশল এবং মুসলিম উম্মাহ্র শত্রুদের মোকাবিলায় প্রতিরোধের ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। মুসলমানদের স্বাধীনতা ও ইসলামকে সমুন্নত রাখতে বলদর্পিতার বিরুদ্ধে লড়াই করে যাঁরা শহীদ হয়েছেন সেই সব মহান শহীদের রক্তের সাথে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছি যে, প্রতি বছর ৩ জানুয়ারি হাজি কাসেম সোলাইমানির শাহাদাত বার্ষিকীকে বিশ্ব প্রতিরোধদিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করতে ভুলব না।

ড. সাইয়্যেদ হাসান সেহাত
কালচারাল কাউন্সেলর
সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস
ঢাকা, বাংলাদেশ ।

কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে মানবতার ঐক্য ও ইসলামি ঐক্য

নূর হোসেন মজিদী

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

'(আদিতে) মানবমণ্ডলী একটিমাত্র উম্মাহ্ (আদর্শিক জনগোষ্ঠী) ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে নবীদেরকে উত্থিত করলেন এবং তাদের সাথে সত্যতা সহকারে কিতাব নাযিল করলেন যাতে তারা লোকদের মধ্যে তাদের মতপার্থক্যের বিষয়ে ফয়সালাহ্ করে দেয়, আর যাদের কাছে অকাট্য নিদর্শনাদি এসে যাওয়ার পরে তা দেয়া হয়, তারা নিজেদের মধ্যে বিদ্রোহাত্মকভাবে ব্যতীত সে ব্যাপারে মতপার্থক্য করে নি। অতঃপর আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে তাদের মতপার্থক্যের বিষয়ে সত্যতা সহকারে পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ্ যাকে চান সরল-সঠিক-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।' (সূরা আল্-বাক্বারাহ্ : ২১৩)

এ আয়াতের ভাষা থেকে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলার এটাই পছন্দ যে, সমস্ত মানুষ একটি অভিন্ন উম্মাহ্ হিসেবে থাকবে, কিন্তু সীমালঙ্ঘনকারীরা তথা আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীরা মতপার্থক্য করে এবং এর ফলে সেই আদি উম্মাহ্ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে মানব প্রজাতির ব্যাপক বিস্তারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে, কোনো কোনো জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে অতীতের নবী-রাসূলগণের (আ.) পরিচয় ও শিক্ষা হারিয়ে যায়, বা বিকৃত হয়ে যায়, বা তাদের কাছে যা ছিল তা পরিবর্তিত কালের দাবি পূরণের জন্য যথেষ্ট ছিল না, কিন্তু এ অবস্থায় নতুন আগত নবী-রাসূলগণের (আ.) নবী-রাসূল হওয়ার ব্যাপারে তাদের অনেকের জন্য ইতমামে হুজ্জাত হয় অর্থাৎ তারা নতুন আগত নবী-রাসূলগণের (আ.) নবী-রাসূল হওয়ার ব্যাপারে ইয়াক্বীনের অধিকারী হয়, কিন্তু অপর অনেকের কাছে, বিভিন্ন বাধার কারণে, যেমন : নতুন আগত নবী-রাসূলগণের পরিচয় সঠিকভাবে না পৌঁছা বা বিকৃতভাবে পৌঁছার কারণে, তাঁদের ব্যাপারে ইতমামে হুজ্জাত হয় নি। এমতাবস্থায় প্রথম ধরনের লোকদের মধ্যে যারা ইখলাসের অধিকারী তারা নতুন আগত নবী-রাসূলগণের ওপর ঈমান এনেছে এবং দ্বিতীয় ধরনের লোকদের মধ্যে যারা ইখলাসের অধিকারী তারা সহজাত প্রবণতা ও সর্বজনীন বিচারবুদ্ধি (عقل) -এর রায় অনুসরণ করেছে।

এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদের শুরুতে দুই ধরনের

লোককে মুত্তাক্বী তথা আহ্লে নাজাত বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের পক্ষে কোরআন মজীদ থেকে হেদায়াত লাভ করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন।

এরশাদ হয়েছে :

ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'এই কিতাব– যাতে কোনো রকমের সন্দেহ-সংশয় নেই; এটি মুত্তাক্বীদের (সাবধানী লোকদের) জন্য পথপ্রদর্শনকারী– যারা ঈমান পোষণ করে ইন্দ্রিয়াতীত সত্তায়, সালাত্ কায়েম রাখে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক্ব দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আর (তারাও মুত্তাক্বী/ সাবধানী হিসেবে এ কিতাব থেকে পথনির্দেশ পাবে) যারা (হে রাসূল!) আমি আপনার প্রতি যা নাযিল করেছি এবং আপনার পূর্বে যা কিছু নাযিল করেছি তাতে ঈমান পোষণ করে। আর তারা (সকলেই) আখেরাতের অস্তিত্বে ঈমান পোষণ করে। এরাই স্বীয় রবের হেদায়াতের ওপর রয়েছে এবং এরাই সফলকাম।' (সূরা আল্-বাক্বারাহ্ : ২-৫)

এছাড়া কোরআন মজীদে বিচারবুদ্ধি ('আক্বল্) ব্যবহারের ওপর বার বার তাকিদ করা হয়েছে এবং সর্বজনীন সুস্থ বিচারবুদ্ধি (عقل سليم -এর দলিলের সাহায্যে তাওহীদ, আখেরাত ও নবুওয়াতে মুহাম্মাদী (সা.)-এর দাও'আত পেশ করা হয়েছে। যেমন, বলা হয়েছে : তারা কি কোনো সৃষ্টি-উৎস ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই

স্রষ্টা? তিনিই পুনঃসৃষ্টি করবেন যিনি প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন। মুহাম্মাদ (সা.) তো (নবুওয়াত-দাবির) পূর্বে গোটা জীবনই মক্কাবাসীদের মধ্যে কাটিয়েছিলেন। (তো তারা কি তাঁর পক্ষে কোরআনের মতো গ্রন্থ রচনা করা সম্ভবপর বলে মনে করে?) তারা যদি কোরআনকে গ্বায়রুল্লাহ্‌র রচিত বলে মনে করে তাহলে এর সমমান সম্পন্ন একটি সূরা রচনা করে আনুক। এগুলোর সবই সর্বজনীন বিচারবুদ্ধির দলিল বা অকাট্য যুক্তি।

মোট কথা, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য নাজাতের ভিত্তি করেছেন তাওহীদ ও আখেরাতে ঈমান এবং যথাযথ কর্ম ('আমালে সালেহ্) সম্পাদনকে। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর সাধ্যাতীত দায়িত্ব প্রদান করেন না এবং তিনি জানেন যে, বিভিন্ন বাধার কারণে অনেক লোকের জন্য নবুওয়াতের ব্যাপারে ইতমামে হুজ্জাত না-ও হতে পারে। অবশ্য কারো জন্য নবুওয়াতের ব্যাপারে ইতমামে হুজ্জাত হওয়া সত্ত্বেও সে নবুওয়াতে ঈমান না আনলে তা হবে নেফাক্বের পরিচায়ক এবং সে ধরনের লোকেরা নাজাত লাভ করবে না। অন্যদিকে কোনো মুখলিস লোকের কাছে কোনো নবী-রাসূলের ব্যাপারে ইতমামে হুজ্জাত না হলেও তাঁদের ব্যাপারে সে সতর্কতার (তাক্বওয়ার) নীতি অনুযায়ী সসম্মান আচরণ করবে এবং এ সম্ভাবনা পোষণ করবে যে, হয়তো তিনি নবী ছিলেন, কিন্তু তাঁর পরিচিতি ও শিক্ষা বিকৃত হয়ে গিয়ে থাকবে।

আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাওহীদের ভিত্তিতে আহ্‌লে কিতাবের সাথে ভদ্রজনোচিত ও সসম্মান সহাবস্থানের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

'(হে রাসূল!) বলুন : হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা এসো এমন একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান, তা হচ্ছে : আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো দাসত্ব-উপাসনা করব না এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করব না, আর আল্লাহ্ ব্যতীত আমাদের কতক অপর কতককে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। অতঃপর তারা যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তো (হে ঈমানদারগণ!) তোমরা বল : তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম (আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পিত)।' (সূরা আলে 'ইম্‌রান্ : ৬৪)

নিঃসন্দেহে যাদের সাথে এ ধরনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য চেষ্টা করতে হবে তাদেরকে কাফের, মুশরিক, গোমরাহ্ ইত্যাদি মন্দ অভিধায় অভিহিত করা জায়েয হতে পারে না। এছাড়াও, যেহেতু মুসলমানদের দায়িত্ব অন্যদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে নাযিলকৃত আল্লাহ্‌র দ্বীনের পরিপূর্ণ ও সর্বশেষ সংস্করণ পৌঁছানো ও এর প্রতি আহ্বান জানানো সেহেতু তাদেরকে মন্দ অভিধায় অভিহিত করা হলে তাদের দ্বারা এ দ্বীন গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাই তাদের অনুসৃত ধর্মের ভুলত্রুটি নির্দেশও ভদ্রজনোচিত পন্থায় করতে হবে; এমনকি বিতর্কের ক্ষেত্রেও তারা যে ভাষায় কথা বলে তার চেয়ে উত্তম ভাষায় জবাব দেয়ার জন্য কোরআন মজীদে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এই যেখানে অবস্থা সেখানে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর খাতমে নবুওয়াত ও কোরআন মজীদের পূর্ণাঙ্গ ও সংরক্ষিত ঐশী কিতাব হওয়ার ওপরে ঈমান পোষণকারী মুসলমানদের জন্য অন্য কোনো কোনো ব্যাপারে মতপার্থক্যের কারণে পরস্পর বহুধাবিভক্ত হওয়া এবং পরস্পরকে কাফের, মুশরিক, মুরতাদ, গোমরাহ্ ইত্যাদি মন্দ অভিধায় অভিহিত করা কোনোভাবেই জায়েয হতে পারে না। কারণ, যে সব বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে সে সব বিষয়ে সঠিক মতের ব্যাপারে বিভিন্ন বাধার কারণে কারো কারো জন্য ইতমামে হুজ্জাত না-ও হয়ে থাকতে পারে। সুতরাং নবুওয়াতে মুহাম্মাদী (সা.)-এর প্রতি ঈমান পোষণ না করা সত্ত্বেও আহ্‌লে কিতাবের সাথে যে ধরনের ভদ্রজনোচিত ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন তখন মুসলমানদের পরস্পরের ক্ষেত্রে তার বরখেলাফ আচরণ জায়েয হতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদে বলেছেন যে, আল্লাহর কাছে দ্বীন একমাত্র ইসলাম এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন কবুল করা হবে না। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে যা ইসলাম তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে প্রেরিত কোনো নতুন দ্বীন নয়, বরং হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসূলের দ্বীন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে তাকে পূর্ণতা দেয়া হয়েছে। ইসলাম তা-ই যা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদে উপস্থাপন করেছেন।

মানুষের গড়া ধর্মসমূহ ও আল্লাহ্‌র দ্বীনের মানুষের কৃত বিকৃত রূপসমূহ থেকে কোরআন মজীদে উপস্থাপিত আল্লাহ্‌র দ্বীনের পার্থক্য নির্দেশক অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সকল প্রকার পক্ষপাতিত্ব ও গোষ্ঠীগত সঙ্কীর্ণতা থেকে প্রমুক্ত, সেহেতু মানুষের গড়া ধর্মসমূহের বিপরীতে এ দ্বীনে মানুষের সীমাবদ্ধতাকে

বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, কোরআন মজীদে মুসলমানদেরকে একটি একক উম্মাহ্ (আদর্শিক জনগোষ্ঠী) হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং তাদের জন্য অনৈক্য ও বিভেদ-বিভক্তিকে হারাম করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

'নিঃসন্দেহে তোমাদের এ উম্মাহ্ হচ্ছে এক উম্মাহ্ এবং আমি তোমাদের রব, সুতরাং তোমরা আমারই দাসত্ব কর।' (সূরা আল্-আম্বিয়া' : ৯২)

অন্যদিকে কোরআন মজীদে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়াকে মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মু'মিনদেরকে এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

'আর তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না – যারা তাদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে ও নিজেরা বিভিন্ন দল হয়ে গিয়েছে এবং প্রতিটি দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত।' (সূরা আর্-রূম্ : ৩১-৩২)

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا

'আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্র রশি দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধর এবং বিভক্ত হয়ো না।' (সূরা আলে 'ইমরান্ : ১০৩)

এছাড়া বিভক্তির অন্যতম প্রধান কারণ যে ঝগড়া-বিবাদ তা থেকেও নিষেধ করা হয়েছে; এরশাদ হয়েছে :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

'আর তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না, তাহলে তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রাণবায়ু (শক্তি ও প্রাভাব) হারিয়ে যাবে।' (সূরা আল্-আন্ফাল্ : ৪৬)

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, কোরআন মজীদে তাওহীদ ও আখেরাতে ঈমান পোষণকারী এবং যথাযথ কর্ম ('আমালে সালেহ্) সম্পাদনকারী জনগোষ্ঠীসমূহের সাথে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে বহুর মধ্যে সমঝোতা (اتحاد) , কিন্তু নবুওয়াতে মুহাম্মাদীতে ঈমান পোষণকারীদের জন্য সে ধরনের সমঝোতার নির্দেশ দেয়া হয় নি, বরং তাদেরকে একটি উম্মাহ্ – একটি অবিভাজ্য সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং বিভক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে। অর্থাৎ কোরআন মজীদ উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য এককত্বের (وحدة) প্রবক্তা।

সুতরাং সুস্পষ্ট যে, উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য বহুধাবিভক্ত হওয়া কোনোমতেই জায়েয হয় নি। কিন্তু অবাঞ্ছিত বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, তা সত্ত্বেও তারা বহুধাবিভক্ত হয়েছে।

বাস্তবে আমরা মুসলমানদের এই বিভেদ ও অনৈক্যের বিষময় পরিণতি দেখতে পাচ্ছি।

বর্তমানে বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা পৌনে দু'শ' কোটি, কিন্তু তা সত্ত্বেও বৈশ্বিক অঙ্গনে তাদের তেমন কোনো প্রভাব নেই। এ কারণেই, তারা যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে পিছিয়ে আছে শুধু তা-ই নয়, ইসলাম ও মুসলমান আজ আদর্শিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক দিক থেকে দুশমনদের হামলার শিকার। বিশেষত ইসলামের প্রথম ক্বিবলা বাইতুল মুক্বাদ্দাসসহ পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন দীর্ঘ সাত দশকেরও বেশি কাল যাবত যায়নবাদীদের অবৈধ দখলে, কিন্তু পৌনে দু'শ' কোটি মুসলমান তা উদ্ধারের জন্য কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে নি। ইরানের ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের পর বিপ্লবের নেতা হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) মুসলিম উম্মাহ্কে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে মাহে রামাযানের শেষ শুক্রবারকে বিশ্ব ক্বুদস্ দিবস এবং হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১২ই থেকে ১৭ই রাবী'উল আউয়ালকে ইসলামি ঐক্য সপ্তাহ হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু তাতে দ্বীনদার মুসলমানদের অনেকে সাড়া দিলেও বিশ্বের মোট মুসলিম জনশক্তি অনুপাতে তা মোটেই যথেষ্ট নয় এবং তা চৈন্তিক অনৈক্যের কারণেই।

মুসলমানদের এই বিভেদ-অনৈক্যের কারণেই ইসলামের আদর্শিক সীমান্ত বার বার দুশমনদের গুরুতর আগ্রাসনের সম্মুখীন হচ্ছে। এমনকি তাদের দুঃসাহস এতোই বেড়ে গিয়েছে যে, তারা হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-কে অবমাননা করতেও দ্বিধা করছে না। এর সর্বসাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে ফরাসি সাময়িকী 'শার্লি এবদো'তে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অবমাননা করে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ। কেবল যে সাময়িকীটি তার পাঁচ বছর আগে প্রকাশিত এ ব্যঙ্গচিত্রটি পুনঃপ্রকাশ করেছে তা নয়, এটি ফ্রান্সের বিভিন্ন সরকারি ভবনেও প্রদর্শিত হয়েছে। এমনকি স্বয়ং ফরাসি প্রেসিডেন্ট মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে এটি নিষিদ্ধ করতেই কেবল অস্বীকৃতি জানান নি, সরকারি ভবনে প্রদর্শন বন্ধ করতেও অস্বীকৃতি জানিয়ে ইসলামবিদ্বেষী জঘন্য মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অথচ ফ্রান্সসহ সমগ্র পাশ্চাত্যে তথাকথিত হলোকস্ট সম্পর্কে অনুসন্ধানী তথ্যাদি প্রকাশ নিষিদ্ধ; এ নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে তারা মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা ভুলে যায়। অধিকন্তু কোনো পবিত্র ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ তথা অবমাননা করা কখনোই মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হতে পারে না। শুধু তা-ই নয়, ফ্রান্সে মুসলিম নারীদের হিজাব পরিধানকে নিষিদ্ধ করার সময়ও তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা মনে ছিল না।

সর্বপ্রথম ইসলামি বিপ্লবের বর্তমান রাহবার হযরত আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ী এ ব্যঙ্গচিত্র পুনঃপ্রকাশ ও প্রদর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেন। এরপর সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে ফরাসি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নিন্দা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকে ফরাসি পণ্য বর্জন করছেন। এটা আশার কথা। কিন্তু সার্বিকভাবে বিশ্বের মুসলিম জনগণ ও সরকারগুলোর পক্ষ থেকে যে ধরনের সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন ছিল তা এখনো গৃহীত হয় নি।

আসলে উম্মাহ্র মূল সমস্যা যে চৈন্তিক ক্ষেত্রে বিভেদ-অনৈক্য তার নিরসন হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অবমাননাসহ ইসলামের আদর্শিক সীমান্তে আগ্রাসন চালানোর মতো দুঃসাহস ইসলামের দুশমনদের হতো না। তাই এ সমস্যার সমাধানকেই সব কিছুর ওপরে অগ্রাধিকার দেয়া অপরিহার্য।

প্রশ্ন হচ্ছে, এ সমস্যার নিরসনের জন্য করণীয় কী?

সর্বপ্রথম করণীয় হচ্ছে আল্লাহ্র দ্বীনকে ঠিক সেভাবে দেখার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে হবে যেভাবে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদে উপস্থাপন করেছেন। এর ভিত্তিতে নিজেদের জন্য উগ্রপন্থা (ইফ্রাত্ব) ও শিথিলপন্থা (তাফ্রীত্ব) হতে মুক্ত একটি মধ্যমপন্থী উম্মায় তথা ভ্রাতৃসম্প্রদায়ে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে – ঠিক যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন :

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

'আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থী উম্মাহ্ বানিয়েছি যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য শাহীদ (সত্যের সাক্ষী/ দ্বীনের মূর্ত প্রতীক) হও এবং রাসূল তোমাদের জন্য শাহীদ (সত্যের সাক্ষী/ দ্বীনের মূর্ত প্রতীক) হন।' (সূরা আল্-বাক্বারাহ্ : ১৪৩)

এর ভিত্তিতে, 'আক্বায়েদের ক্ষেত্রে শাখা-প্রশাখাগত বিষয়াদিতে মতপার্থক্য সত্ত্বেও খোদাদ্রোহী ব্যতীত উম্মাতে মুহাম্মাদীর সদস্যদেরকে আন্তরিকভাবেই আহ্লে নাজাত গণ্য করতে হবে এবং তাদের কাউকে ও অন্য কোনো আহ্লে নাজাতকে কাফের, মুশরিক, মুরতাদ, মুনাফিক্ব ইত্যাদি গণ্যকরণ ও অভিহিতকরণ পরিহার করতে হবে।

উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে একক উম্মাহ্র অনুভূতি গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। বিশেষ করে সকল ক্ষেত্রে সত্য ও ন্যায়ের সপক্ষে দাঁড়াতে হবে এবং খোদাদ্রোহীদের (তাদের জন্মগত ধর্মীয় পরিচয় যা-ই হোক না কেন), বিশেষত আল্লাহ্র বান্দাদেরকে স্বীয় দাসে পরিণতকারী বলদর্পী ও আধিপত্যবাদীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

বিভক্তি দূরীভূত করে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে কোরআন মজীদে কাঙ্ক্ষিত একক ও অবিভাজ্য উম্মায় পরিণত করার বিষয়টি জোর করে চাপিয়ে দেয়ার বিষয় নয় এবং সেভাবে তা অর্জন করা সম্ভবও নয়, বরং সে জন্য এমন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে যাতে স্বাভাবিক পন্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ফাটল ও বিভক্তি দূরীভূত হয়ে উম্মাতে মুহাম্মাদী পুনরায় সুসংহত একক অবিভাজ্য সত্তায় পরিণত হতে পারে। আর বলাই বাহুল্য যে, তা হতে হবে চৈন্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক এককত্বের মাধ্যমে– যা কেবল 'ইল্মী পন্থায় অর্জিত হতে পারে।

ইরানের ইসলামি বিপ্লবের মহান নেতা হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ্.) ইসলামি উম্মাহ্কে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন। বিশেষত তিনি সব সময়ই ইসলামের প্রথম ক্বিবলা বায়তুল্ মুক্বাদ্দাসসহ ফিলিস্তিন ভূমিকে মুক্ত করার জন্য উম্মাহ্র ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন; ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, তিনি উম্মাহ্র মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ব ক্বুদ্স্ দিবস ও ইসলামি ঐক্য সপ্তাহ্ ঘোষণা করেন।

বস্তুত ইসলামের অকাট্য জ্ঞানসূত্রসমূহের আলোকে 'আক্বায়েদের শাখা-প্রশাখাসমূহ এবং মৌলিক ফরয/ ওয়াজিব্ ও হারামের ক্ষেত্রে বিরাজমান মতপার্থক্যসমূহ নিরসন করা সম্ভব হলে প্রায়োগিক (ফরয/ ওয়াজিব্ ও হারাম সংক্রান্ত বিধান বাস্তবায়নের শর্তাবলি) এবং গৌণ বিষয়াদির (মুস্তাহাব্ ও মাক্রূহ্র) ক্ষেত্রে বিরাজমান মতপার্থক্যসমূহ কোনো সমস্যা নয়।

অত্র নিবন্ধকারের দৃষ্টিতে, ইসলামের অকাট্য জ্ঞানসূত্র চারটি যার সাহায্যে 'আক্বায়েদ ও তার শাখা-প্রশাখাসমূহ এবং মৌলিক ফরয/ ওয়াজিব্ ও হারামসমূহ প্রমাণিত হতে পারে। তা হচ্ছে : (১) সর্বজনীন সুস্থ বিচারবুদ্ধি, (২) কোরআন মজীদ, (৩) মুতাওয়াতির্ হাদীস ও (৪) শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে উম্মাহ্র মধ্যে শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা অভিন্ন মত ও আমলসমূহ (ইজ্মা'এ উম্মাহ্)।

এ জ্ঞানসূত্রগুলো এমন যা সকল মুসলমানের নিকট সমভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়া অপরিহার্য। কোরআন মজীদে সকল মুসলমানই ঈমান পোষণ করে, অন্যদিকে শেষোক্ত দু'টি জ্ঞানসূত্র নিঃসন্দেহে সুন্নাতে রাসূল (সা.)-এর উদ্ঘাটনকারী। তবে সর্বজনীন সুস্থ বিচারবুদ্ধিকে ইসলামের অন্যতম অকাট্য জ্ঞানসূত্র হিসেবে গ্রহণ করা, বিশেষত ক্রমের দিক থেকে প্রথমে স্থান দেয়ার ব্যাপারে অনেকের আপত্তি থাকতে পারে।

এ প্রসঙ্গে কেবল এতোটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, কোরআন মজীদ বিচারবুদ্ধি ('আক্বল্) ব্যবহারের ওপর বার বার গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং 'আক্বলী দলিলের ভিত্তিতে লোকদেরকে তাওহীদ, আখেরাত, নবুওয়াতে মুহাম্মাদী (সা.) ও কোরআন মজীদের প্রতি ঈমানের আহ্বান জানিয়েছে, আর একজন অমুসলিম – যে নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর ও কোরআন মজীদের প্রতি ঈমান পোষণ করে না – সর্বজনীন সুস্থ বিচারবুদ্ধির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে ইসলামের সত্যতায় উপনীত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। সুতরাং সর্বজনীন সুস্থ বিচারবুদ্ধি ইসলাম-গৃহে প্রবেশের দরজাস্বরূপ। তাই সর্বজনীন সুস্থ বিচারবুদ্ধির আলোকে যা কিছুকে সত্য জেনে একজন অমুসলিম ইসলামে ঈমান এনেছে অতঃপর ইসলামের অন্য কোনো জ্ঞানসূত্র থেকে, এমনকি কোরআন মজীদ থেকেও এর বরখেলাফ কোনো তাৎপর্য গ্রহণ করা যেতে পারে না।

আত্মগঠন ও মানবীয় গুণাবলি অর্জনে ইমাম হাসান (আ.)-এর কর্মপন্থা

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী (আ.) হলেন আহলে বাইতের সিলসিলায় মুসলমানদের দ্বিতীয় ইমাম। নবীদুহিতা মা ফাতেমা আর শেরে খোদা হযরত আলী (আ.)-এর পবিত্র দাম্পত্য জীবনের সর্বপ্রথম ফল। বেহেশতের বাদশা এ মহান ইমামের জন্ম পবিত্র মদিনা মুনাওয়ারায়, তৃতীয় হিজরি সনের মধ্য রমজানে। নানা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তেকালের সময় তিনি ছিলেন সাত বছরের বালক। অতঃপর দীর্ঘ ত্রিশ বছর স্বীয় পিতা হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের সাহচর্যে অতিবাহিত করেন। ৪০ হিজরিতে স্বীয় পিতার শাহাদাতের পর তিনি ইমামতের মাকামে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু আমীর মুয়াবিয়ার নিরন্তর চক্রান্তের মধ্যে তিনি মাত্র ১০ বছর ইমামতি দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন। হিজরি পঞ্চাশ সনের ২৮শে সফর তারিখে (প্রসিদ্ধ মতানুসারে) মাত্র ৪৮ বছর বয়সে তাঁকে বিষ প্রয়োগে শহীদ করা হয়। মদিনার 'জান্নাতুল বাকী' গোরস্থানে তাঁর পবিত্র সমাধি অবস্থিত। *(বিহারুল আনওয়ার, ৪৪ : ১৩৪)* আল্লামা সুয়ূতী লিখেছেন : 'হাসান (রা.) অশেষ চারিত্রিক ও মানবীয় গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন মহৎপ্রাণ, অধ্যবসায়ী, স্থিরচিত্ত, ব্যক্তিত্ববান, উদার এবং প্রশংসনীয় ব্যক্তি।' *(তারিখুল খুলাফা : ১৮৯)*। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক যে, বিশ্বনবীর জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র এমনই গুণের অধিকারী হবেন।

মুসলমানদের মধ্যে একটি চিরায়ত নিয়ম হচ্ছে কোন ব্যক্তির শান-মানকে পরিমাপ করা হয় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট তার স্থান কী ছিল তার উপর বিচার করে। এদিক থেকে বলা যায় যে, নিঃসন্দেহে ইমাম হাসান রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট প্রাণাধিক প্রিয় ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে শত-সহস্রবার ইমাম হাসানের প্রতি তাঁর সে গভীর ভালবাসার প্রমাণ রেখেছেন। ইমাম বুখারী হযরত আবু বকর হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন, 'আমি নবীজীকে মিম্বারের উপরে বসা অবস্থায় দেখেছি যখন হাসান ইবনে আলী তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি একবার সমাগত লোকদের দিকে মুখ ফেরাচ্ছিলেন এবং আরেকবার তার দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন : আমার এই পুত্র হচ্ছে সাইয়্যেদ তথা নেতা। *(সহীহ্ বুখারী, বৈরুত প্রিন্ট, ৩ : ৩১)* তিনি আরও বলছিলেন : 'যে হাসান ও হোসাইনকে ভালবাসলো সে আমাকে ভালবাসলো। আর যে এ দুজনকে রাগন্বিত করলো সে আমাকে রাগন্বিত করলো।' *(বিহারুল আনওয়ার, ৪৩ : ২৬৪)*। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আপন হাতে প্রতিপালিত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন তাই নিঃসন্দেহে প্রতিটি মুসলমান ঘরের সন্তানদের প্রতিপালন পন্থার ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ। এ প্রবন্ধে ইমাম হাসান মুজতবা (আ.)-এর জীবনচরিত থেকে মুসলমানদের ব্যক্তি চরিত্র গড়ার সেই রীতিপন্থাকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

মানব সন্তান তার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে এক অমিয় সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে। তার মধ্যে নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনাসমূহ বাস্তবরূপ লাভ করে সঠিক প্রতিপালনের মাধ্যমে। যোগ্যতম প্রতিপালকের তত্ত্বাবধানে মানবের অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রতিভাসমূহ বিকশিত হয় যা তাকে পূর্ণতার পাণে পরিচালিত করে, মানবিক গুণাবলির অধিকারী করে তোলে এবং আত্মিক পরিশুদ্ধি দান করে। মহাপুরুষদের সীরাত তথা জীবনচরিত এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এখানে সীরাত বলতে মাসুমগণের সেই জীবনাচারকে বুঝানো হয়েছে যা অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল, নিয়মানুবর্তী এবং রীতি তথা পদ্ধতিগত। ইমাম হাসান (আ.)-এর জীবনাচারে এ বৈশিষ্ট্যগুলো এতটাই উজ্জ্বল হয়ে আলো ছড়িয়েছে যে, প্রতিটি মুসলমানের ব্যক্তি চরিত্র গঠনে তা অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে।

ইমাম হাসান (আ.) মানবের সঠিক প্রতিপালনের জন্য তার বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টির (بصيرت) সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ জোরারোপ করেছেন। এটা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি যা হাকিকতকে জানার ক্ষেত্রে অস্তিত্বসত্তার গভীর থেকে আরও গভীরে অনুপ্রবেশ করতে পারে। তখন অন্তর্দৃষ্টিবান ব্যক্তি বস্তুনিচয়ের প্রকৃত স্বরূপকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। ইমাম হাসান (আ.) মানুষের মধ্যে অন্য সবকিছুর আগে এ অর্থটিকেই শক্তিশালী করার প্রয়াস চালাতেন। যাতে তারা আপাতঃদৃষ্টির পথ পরিহার করে এবং সত্যে উপনীত হতে সক্ষম হয়। কেননা, অন্তর্দৃষ্টিই হচ্ছে সঠিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি। পক্ষান্তরে আপাতঃদৃষ্টির উপর নির্ভর করে চললে ভ্রান্তির সম্ভাবনা যেমন বৃদ্ধি পায়, তদ্রূপ পদে পদে বিপথগামী হওয়ার ঝুঁকিও থাকে অনেক বেশি। মাসুম ইমামগণের বিশেষ করে ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) এবং ইমাম হাসান মুজতবা (আ.) তৎকালীন জনগণের এই অর্ন্তদৃষ্টির অভাবহেতু সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কেননা, এমনকি তাঁদের সমর্থনকারীরও শত্রুর প্রচারণার প্রভাবে প্রতারণার কবলে পড়ে। মুয়াবিয়ার কূটচালের মোকাবিলায় তারা অবিচল থাকতে পারে নি। ফলশ্রুতিতে আমিরুল মুমিনীন আলী (আ.) সিফফীনের ময়দানে সালিশ মানতে বাধ্য হন এবং ইমাম হাসান মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। *(দ্র. শেইখ মুফিদ, আল-জামাল : ৬৯)*

একারণে ইমাম হাসান (আ.) স্বীয় কথা ও কর্মের মাধ্যমে জনগণকে বিচক্ষণ করে গড়ে তোলা ও সচেতন করার যথাসাধ্য প্রয়াস চালান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন : 'সর্বাপেক্ষা দৃষ্টিবান চক্ষু হচ্ছে সেই চক্ষু যা কল্যাণের পথে অনুপ্রবেশ করে, আর সর্বাপেক্ষা শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কান হচ্ছে সেই কান যা নিজের মধ্যে উপদেশকে শিক্ষা করে এবং তা থেকে উপকার গ্রহণ করে। আর সর্বাপেক্ষা সুস্থতম অন্তর হচ্ছে সেই অন্তর যা সংশয়-সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকে।' *(তুহাফুল উকুল আন আলে রাসূল : ১৭০)* মানুষ যদি এই তিনটি উপকরণ ও

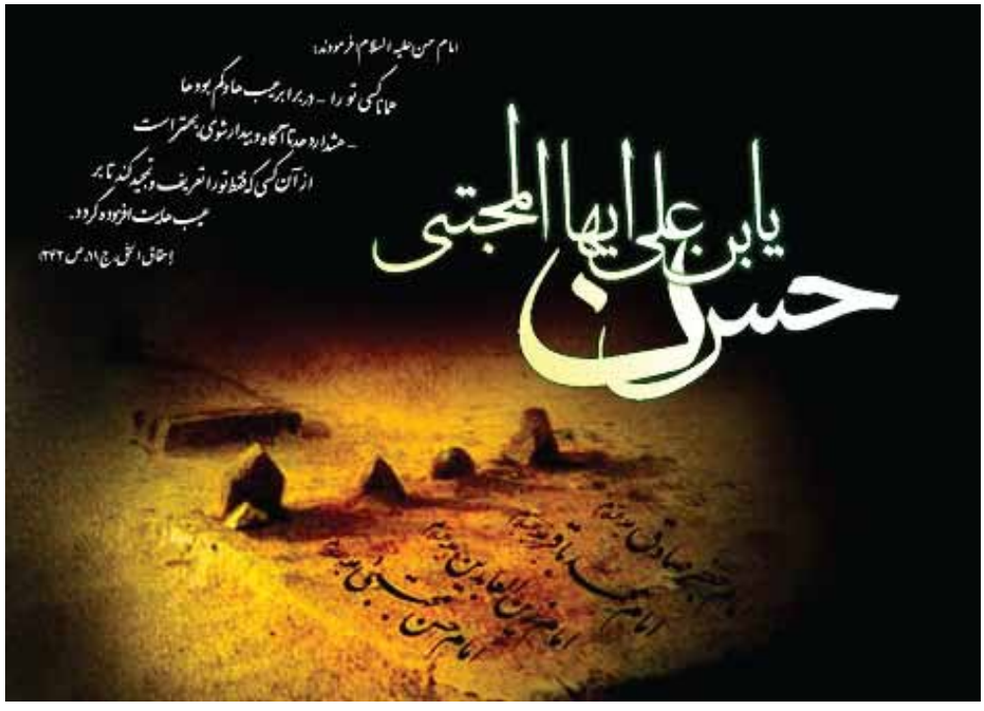

মাধ্যমকে যথাযথভাবে কাজে লাগায় তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সে প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে। দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তি হচ্ছে এমন দুটি মাধ্যম যা তথ্যাবালকে চিন্তা ও বুদ্ধির কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ অন্তরে প্রবেশ করায়। যদি এই আমদানিকৃত কাঁচামালসমূহ পরিশোধনকৃত হয়ে থাকে, আর অন্তরও যদি সংশয় ও সন্দেহের দোলাচল থেকে মুক্ত থাকতে পারে, তাহলে নিখাঁদ তথ্যাবলি প্রবেশের মাধ্যমে অন্তর সুচি ও স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে অন্তর্দৃষ্টির কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ইমাম হাসান অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের উপায় হিসাবে মানুষের আত্মপরিচিতি এবং আত্মগঠনের দিকে মনোযোগী হওয়ার উপদেশ দেন। স্বীয় পুত্রের উদ্দেশ্যে এক অসিয়তে ইমাম বলেন : 'পুত্র আমার! কারও সাথে ভ্রাতৃত্বের (বন্ধুত্বের) বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যতক্ষণ না তাকে সর্বদিক থেকে চিনবে এবং নিশ্চিত হতে পারবে! অতঃপর যখন এরূপ ব্যক্তিকে খুঁজে পাবে তখন সর্ববিষয়ে তার সাথে থাকবে।' *(তুহাফুল উকুল : ১৬৮)* অর্থাৎ ইমাম বন্ধুত্ব স্থাপনের পূর্বে ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে বিচক্ষণতার পন্থা অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছেন। যদি সর্বদিক দিয়ে তাকে চেনা হয় এবং আস্থা আসে কেবল তখনই তার সহচর হওয়া যাবে। কারণ, মানুষের প্রতিপালনে এবং ব্যক্তিত্ব ও পরিচয়সত্তা গঠনে বন্ধুর ভূমিকা অত্যধিক। একারণেই যারা ইমাম হাসানকে যথাযথভাবে চিনতো না তাদের নিকট নিজের পরিচয় তুলে ধরতেন এবং বলতেন : 'আমি হলাম হাসান, রাসূলুল্লাহর পুত্র, আমি হলাম সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারীর পুত্র, আমি তাঁর পুত্র যিনি রিসালাতের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন...।' *(তুহাফুল উকুল আন আলে রাসূল : ১৬৭)* এ বাক্যগুলোর মধ্যে ইমাম প্রকৃতপক্ষে শ্রোতাদের কাছে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন। যাতে কেউ যদি তাকে না চিনে, সে যেন তাঁর পরিচয় জানতে পারে এবং জেনেশুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। তাই তো তিনি বক্তব্য শুরুই করেছেন এভাবে : 'যে আমাকে চিনে সে তো চিনেই। আর যে আমাকে চিনে না তার জন্য আমি আমার পরিচয় বলছি...।'

এরপর মানুষের আত্মগঠনের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, মানুষ তাকওয়া ও নফসের তাহযীব তথা পরিশীলনের ক্ষেত্রে যতটা এগিয়ে যেতে পারবে, তদনুপাতে তার অন্তর্দৃষ্টির শক্তিও বৃদ্ধি লাভ করবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম হাসান এক উপদেশবাণীতে সকল আত্মগঠনে ব্রতী মুসলমানদের উদ্দেশে বলেন : 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহর প্রতি তাকওয়া বজায় রাখার এবং নিরন্তর চিন্তা-অনুধ্যানের আহ্বান জানাচ্ছি। কেননা, চিন্তা-অনুধ্যান হচ্ছে সকল কল্যাণের জনক এবং তার জননী।' *(মাজমুআতু ওয়ারাম, ১ : ৫৩)* ইমামের এ উপদেশ বাণী থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, সঠিক চিন্তা-অনুধ্যান এবং অন্তর্দৃষ্টি অর্জন হচ্ছে তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির ফসলস্বরূপ। ইমামের অপর এক উপদেশ বাণীতে এসেছে যে, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে তাকওয়ার প্রতি উপদেশ দিয়েছেন। এ তাকওয়াকে তিনি নিজের পরম সন্তুষ্টির কারণ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। তাকওয়া হচ্ছে সকল তওবার দরজাস্বরূপ এবং সকল প্রজ্ঞাশীলতার মূল। মুত্তাকীদের মধ্যে যাঁরা সফলকাম হয়েছেন তাঁরা এ তাকওয়ার মাধ্যমেই সফলকাম হয়েছেন।' *(তুহাফুল উকুল : ১৬৭)*

সুতরাং ইমাম হাসান (আ.)-এর দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টি অর্জনে তার আত্মপরিচিতির জ্ঞানের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, অনুরূপভাবে তার তাকওয়া এবং আত্মশুদ্ধির ভূমিকাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করেন। এ অন্তর্দৃষ্টিকে কোরআনে 'ফুরকান' তথা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইমাম হাসান (আ.) জীবনের সর্ব অঙ্গনে এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি মুয়াবিয়ার সাথে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তির প্রভাব এবং মুসলমানদের জন্য এর সুফল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন : 'যে অধিকার নিতান্তই ছিল আমার প্রাপ্য, মুয়াবিয়া তা নিয়ে আমার সাথে বিবাদে লিপ্ত হল। আর আমি উম্মতের মঙ্গলার্থে এবং তাদের রক্তপাত এড়াবার লক্ষ্যে সে অধিকার তার হাতে তুলে দিলাম।' *(বিহারুল আনওয়ার, ৪৪ :*

২৩) অন্যত্র ইমাম বলেন, 'আমি এ কাজ করেছি স্রেফ রক্তপাত এড়াবার জন্য এবং নিজের, পরিবারের এবং একনিষ্ঠ সহচরবৃন্দের প্রাণভয়ে।' *(প্রাগুক্ত : ৫৫)* যারা উগ্রতা প্রদর্শন করত এবং ইমামের প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ করতো তারা আসলে অজ্ঞ ছিল এবং সন্ধিচুক্তির দর্শন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল না। মুয়াবিয়া ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে এবং বনি হাশিমের প্রতি চরম বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে যেভাবে হত্যা ও ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছিল এবং ইসলামে সীমাহীন বিকৃতি ও কু-সংস্কৃতির প্রচলন ঘটিয়ে চলেছিল তার বিপরীতে যুগের নিষ্পাপ ইমাম হিসাবে একদিকে দ্বীনকে সুরক্ষা এবং অপরদিকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে নিধনের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার গুরুদায়িত্ব অনুভব করেন। আর তখনই তিনি মুয়াবিয়ার অন্যায্য সন্ধির প্রস্তাবে সাড়া দেন। ইমাম যখন স্বীয় সহচরবৃন্দের কাছে এই নির্মম বাস্তবতার ব্যাখ্যা তুলে ধরেন তখন তাদের অনেকেই এ সত্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় এবং সরল সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর অটল থাকে।

অন্তর্দৃষ্টি ও বিচক্ষণতা অর্জনের পর একজন মুসলমানের জন্য তার দ্বীনি বিশ্বাসসমূহকে লালন করা একান্তভাবে আবশ্যক। কেননা, অন্তর্দৃষ্টির সাথে সঠিক আকিদা-বিশ্বাসের সংযোগ থাকলেই কেবল মানুষ সন্দেহ-সংশয় ও ভ্রষ্ট চিন্তাধারার বিপরীতে অটল থাকতে পারে। জীবনের উৎপত্তি এবং এর পরিসমাপ্তি, যা কোরআনের 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করব'– এ আয়াতের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, এ বিশ্বাস একজন মুমিনকে সঠিক পরিচয়সত্তা দান করে। এ বিশ্বাস যতই যুক্তিসিদ্ধ ও প্রমাণসাপেক্ষ হবে, জীবনে তার প্রভাব ততই অধিক হবে। সত্য ও সঠিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যে ব্যক্তিত্ব ও পরিচয়সত্তা জন্ম লাভ করবে তা ব্যক্তির জন্য ততই মর্যাদা ও সম্মান বয়ে আনবে। এ মর্মে মহামহিম আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী, তাদের ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।' *(ইবরাহীম : ২৭)*

ইমাম হাসান (আ.) মুয়াবিয়া কর্তৃক সৃষ্ট চরম রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেও কীভাবে দ্বীনি বিশ্বাস ও মূল্যবোধসমূহের উপর সুদৃঢ় থাকতে হয় তা জনগণকে দেখিয়ে গেছেন। পরম ধৈর্য, অবিচল অধ্যাবসায় এবং পরম তিতিক্ষার মাধ্যমে তিনি শান্তভাবে সেসব সংকট ও সমস্যার মোকাবিলা করেন। যদিও তাঁর অজ্ঞ ও অসহিষ্ণু সহচরবৃন্দ এপথে তাঁকে কোন সহযোগিতা তো করেইনি, বরং মুয়াবিয়ার প্ররোচনায় নিজেরাই একাধিকবার ইমামের বিরুদ্ধে ঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তাঁর তাঁবুতে আক্রমণ চালায় এবং তাঁর মাল-সামান লুট করে নিয়ে যায়। এমনকি তারা ইমামের পবিত্র শরীরে আঘাত করে জখম করে ছাড়ে। আহত দেহ নিয়ে তিনি কিছুদিন মাদায়েনে অবস্থান করেন। এহেন অবস্থায়ও তিনি ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হননি এবং লোকদের দ্বীনি বিশ্বাসকে মজবুত করণের প্রচেষ্টা থেকে বিমুখ হননি। একত্ববাদী দীক্ষার বিকাশ সাধনে তিনি নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যান। এপ্রসঙ্গে এক ভাষণে ইমাম বলেন : 'মহান আল্লাহ তোমরা– মানুষদেরকে অযথা এবং বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি। তিনি তোমাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেননি। তোমাদের আয়ুষ্কালের নির্ধারিত সময় তিনি লিখে দিয়েছেন। তোমাদের মাঝে তোমাদের জীবিকাকে তিনি বণ্টন করে দিয়েছেন। যাতে প্রত্যেক ধীসম্পন্ন ব্যক্তি তার অবস্থানকে জানতে পারে এবং যা তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে তা সে পেয়েছে আর যা তার থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে তা সে কখনও পাবে না।' *(তুহাফুল উকুল : ২৩২)*

অনেক মানুষ রয়েছে যারা নিজেদের মূল্য ও মর্যাদাকে উপলব্ধি করে না। আর একারণেই অনায়াসে অপমান ও হীনতাকে বরণ করে নেয়। কিন্তু যদি সে তার মূল্য ও মর্যাদায় বিশ্বাস করতো তাহলে স্বীয় জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলত। সে কখনও চিন্তা ও আচরণগত সমস্যার সম্মুখীন হতো না, পথভ্রষ্টতার কবলেও পড়ত না। তাই দ্বীনি বিশ্বাসসমূহকে মজবুত করা মানুষের প্রতিপালন ব্যবস্থায় এবং তার আচরণের সংশোধনে একটি কার্যকরী পদ্ধতি যার উপর ইমাম হাসান (আ.) কথা ও কর্মের মাধ্যমে তাগিদ দিয়েছেন আজীবন।

অন্তর্দৃষ্টি অর্জন এবং দ্বীনি বিশ্বাসসমূহ লালনের পর যে গুণটি মানব জীবনকে আলোকিত করে তোলে সেটা হল বন্দেগি। ইসলাম ও কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদত-বন্দেগি হচ্ছে মানব জীবনের স্পন্দনস্বরূপ। ইবাদতের উদ্দেশ্যেই তার সৃষ্টি। সময়মত ও সঠিক পন্থায় ইবাদত-বন্দেগি সম্পাদনের মাধ্যমে মানুষ তার চলার পথে অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রসমূহ যেমন সুশৃঙ্খলা, সুপরিকল্পনা, অপরের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, আত্মিক পরিতৃপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ইমাম হাসান মুজতবা (আ.) সর্বদা ইবাদতকে তার পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণরূপেই আঞ্জাম দিতেন। বর্ণিত হয়েছে যে তিনি জীবদ্দশায় ২৫ বার পায়ে হেঁটে হজ্জ পালন করেন। *(বিহারুল আনওয়ার, ৪৩ : ৩৩১)* অনুরূপভাবে তাঁর নামায আদায় সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে যে, যখন নামাযের সময় সমাগত হতো এবং তিনি ওযু করতেন, তখন তাঁর হাঁড়ের জোড়াগুলো কেঁপে কেঁপে উঠত এবং মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে যেত। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন, 'যে কেউ মহান প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, তার এমনটাই হওয়া উচিত।' *(সিবতে আকবার : ৪১)* তিনি যখন মসজিদের দরজায় পৌঁছতেন, মাথা আকাশের দিকে উঠিয়ে বলতেন, 'হে আল্লাহ! তোমার অতিথি তোমার দরজায় উপস্থিত। হে মহীয়ান! অধম এসেছে তোমার ঘরের দরজায়। অতএব, আমার নিকট যে মন্দ রয়েছে তা তোমার নিকট যে সুন্দরতম জিনিস রয়েছে তা দিয়ে ক্ষমা করে দাও, হে দয়াময়।' *(মানাকিব-ই আলে আবি তালিব, ৪ : ৭)*

তিনি মুসলমানদেরকে মসজিদে গিয়ে জামাআত সহকারে নামায আদায়ে উৎসাহী করার নিমিত্তে বলতেন, 'যে ব্যক্তি নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত করবে সে আটটি জিনিসের যে কোন একটি লাভ করবে : (১) শক্তিশালী খোদায়ী নিদর্শন (২) উপকারী বন্ধুত্ব (৩) নতুন জ্ঞান (৪) প্রতীক্ষিত করুণা (৫) বক্তব্য, যা তাকে সত্য পথে টেনে আনবে (৬) বক্তব্য, যা তাকে হীনতা থেকে রক্ষা করবে (৭) আল্লাহর থেকে লজ্জাবশত পাপ বর্জন অথবা (৮) আল্লাহর ভয়বশত পাপ বর্জন। (তুহাফুল উকুল : ১৬৯) ইমাম মসজিদে গমনাগমনের

এই যে সুফলগুলো উল্লেখ করেছেন তা ব্যবহারিক জীবনে উপকারী বটে। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে, আল্লাহ সবকিছুকে তার প্রতি আনুগত্যশীল করে দেন।' *(মুস্তাদরাক আল-ওসায়িল, ৩ : ৩৫৯, হাদিস ৩৭৭৮)* তিনি ইবাদতকে আত্মশুদ্ধির উপায় হিসাবে গণ্য করেছেন এবং বলেছেন, 'নিশ্চয় যে ব্যক্তি ইবাদতকে ইবাদতের জন্যই অন্বেষণ করবে তার আত্মশুদ্ধি অর্জিত হবে।' *(তুহাফুল উকুল : ১৭০)* ইমাম স্বয়ং যেমন ইবাদতের আশেক ছিলেন এবং আল্লাহর আনুগত্যকে মানুষের আত্মবিকাশ ও পূর্ণতা লাভের কারণ বলে মনে করতেন, তদ্রূপ অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে আহ্বান জানাতেন। এভাবে তিনি তাদের মাঝে বন্দেগির প্রাণশক্তি লালন করতেন।

মায়া-মমতা এবং ভালবাসা হচ্ছে আরেকটি অন্যতম মানবীয় গুণ যা ইমাম হাসান (আ.)-এর কর্মপন্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ছিল। কেননা, অন্যদের প্রতি সদয় হওয়া এবং সম্মান প্রদর্শন করা মানব প্রকৃতির একটি স্বভাবজাত চাহিদা, যা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দরকার হয়। মানুষের এই সহজাত চাহিদাটি তার ব্যবহার ও অন্যদের সাথে তার আচরণে প্রকাশ পায়। মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমি আমার নিকট হতে মানুষের মনে তোমার প্রতি ভালবাসা সঞ্চারিত করেছিলাম, যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।' *(ত্বা-হা : ৩৯)* এ খোদায়ী বাণী থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, মানবের আত্মগঠন তথা সঠিক প্রতিপালনে তার ভাবাবেগ ও ভালবাসার মনোবৃত্তিকে বিশেষভাবে পরিচর্যা করার আবশ্যকতা রয়েছে। কেননা, এই মানবিক গুণটি তার জীবনের মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌঁছতে অত্যধিক প্রভাব রাখে। মহানবী (সা.)-কে প্রশ্ন করা হলো যে, পুরুষ ও নারিগণের মধ্য থেকে কারা আপনার নিকট অধিকতর প্রিয়? তিনি উত্তর দিলেন, 'ফাতেমা ও তার স্বামী।' তদ্রূপ হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে ইমাম আলী (আ.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে প্রশ্ন করেন, 'আমাদের মধ্যে কে আপনার অধিক প্রিয়, আমি নাকি সে?' তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, 'সে আমার অধিকতর প্রিয় আর তুমি আমার নিকট অধিকতর সম্মানিত।' *(বিহারুল আনওয়ার, ৪৩ : ৩৮)* রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর দুই দৌহিত্র হাসান ও হোসাইনের প্রতিও একইরূপ ভালবাসা পোষণ করতেন এবং অন্যদেরকেও তাঁদের প্রতি ভালবাসা রাখার আহ্বান জানাতেন। তিনি বলতেন, 'যে কেউ হাসান ও হোসাইনকে ভালবাসবে সে আমাকে ভালবাসলো আর যে তাদের প্রতি শত্রুতা করবে সে আমার সাথে শত্রুতা করলো।' *(বিহারুল আনওয়ার, ৪৩ : ৩০৪)* গুরুজনদের মমতা ও ভালবাসা সন্তানদের সঠিক প্রতিপালনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। একারণে মাসুমগণের জীবনচরিতে এ মানবীয় গুণটি সবকিছুকে ছাড়িয়ে যেতে দেখা যায়। তাঁরা এমনকি শত্রুদেরকেও আকৃষ্ট করতে এবং তাদেরকে সঠিক পথে দীক্ষা প্রদানের জন্য এটাকে কাজে লাগাতেন। ইমাম হাসান (আ.) নানা রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং পিতা আলী (আ.)-এর জীবন থেকে এ গুণটি উত্তমভাবেই রপ্ত করেছিলেন এবং অন্যদের প্রতিপালনে তা যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক বলেন, ইমাম হাসান (আ.)-এর জনৈকা কানিজ তাঁকে একটি ফুল উপহার দিল। ইমাম সাগ্রহে ফুলটি গ্রহণ করলেন এবং তাকে বললেন, 'তোমাকে আমি আল্লাহর রাহে মুক্ত করে দিলাম।' তখন আমি প্রতিবাদের স্বরে বলে উঠলাম, 'একটি মাত্র ফুলের বিনিময়ে তাকে আপনি মুক্ত করে দিলেন?' ইমাম বললেন, 'আল্লাহ্ কোরআনের মধ্যে আমাদেরকে এমনটাই শিক্ষা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'আর যখন তোমাদের কোন সৌজন্যতার মাধ্যমে অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন করবে।' *(নিসা : ৮৫)* অতঃপর তিনি বললেন, 'এক্ষেত্রে তাকে মুক্ত করে দেওয়াই হচ্ছে অপেক্ষকৃত উত্তম অভিবাদন।' *(জালওয়াহায়ি আয নূরে কোরআন : ২৭)*

একদিন ইমাম হাসান (আ.) এক যুবককে দেখলেন তার সামনে একটি খাবারের পাত্র। আর সে তা থেকে এক লোকমা নিজে খাচ্ছে এবং আরেক লোকমা একটি কুকুরকে খেতে দিচ্ছে। ইমাম যুবককে জিজ্ঞেস করলেন, 'এরূপ করছ কেন?' যুবকটি বলল, 'আমার শরম হচ্ছে যে, নিজে খাবার খাব অথচ এ কুকুরটি ক্ষুধার্ত থাকবে।' ইমাম হাসান যুবকের এ বদান্যতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। তার ভাল কাজের জন্য ইমাম তাকে তার মনিবের নিকট থেকে খরিদ করে মুক্ত করে দিলেন। আর যে বাগিচায় সে কাজ করছিল, সে বাগিচাটি খরিদ করে তাকে দান করলেন। *(আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ : ৩৮)* এভাবেই বিশেষ করে কিশোর ও যুবকদের সঠিক প্রতিপালনে ইমাম হাসান (আ.) মানুষের প্রতি দয়া ও ভালবাসাকে অন্যতম উপকরণ হিসাবে কাজে লাগান। তিনি বলতেন, 'আপন হচ্ছে সেই ব্যক্তি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা যাকে নিকটবর্তী করেছে, যদিও বংশের দিক থেকে সে দূরের হয়ও। আর পর হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা বিবর্জিত, যদিও বংশের দিক থেকে সে কাছের হয়ও।' *(তুহাফুল উকুল : ১৬৮)*

পরিশেষে বলা যায়, অধুনা যুগের যান্ত্রিক জীবন থেকে যে জিনিসটি হারিয়ে যেতে বসেছে সেটা হচ্ছে মানুষের আত্মগঠনের চিন্তা আর মানবীয় গুণাবলির প্রতি মনোযোগ। আজ জীবন হয়ে উঠেছে নিরস আর বিষময়। নতুন নতুন আবিষ্কার আর গগনচুম্বী অট্টালিকা গড়া এ যুগের মানুষের জন্য যতটা না সহজ তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন হচ্ছে তার আত্মগঠন। ইসলাম মানুষের সঠিক প্রতিপালন ও তার মানবিক গুণাবলিকে বিকশিত করার উপর জোর দেয় সবচেয়ে বেশি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) হচ্ছেন মুসলমানদের জন্য উত্তম আদর্শ। সেই রাসূলের ক্রোড়ে লালিতপালিত হয়েছেন ইমাম হাসান (আ.)। কিশোর ও যুবকদের আত্মগঠনে তিনি যে কর্মপন্থা নিজ জীবনে রেখে গেছেন তা এই ইট পাথরের নগর জীবনের মানুষকেও সোনার মানুষে পরিণত করতে সক্ষম। মানুষকে তার আত্মসত্তায় ফিরতেই হবে। তাকে তার জৈবিক খোলস ভেদ করে আত্মায় পৌঁছতে হবে। আত্মার চাহিদাগুলোকে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে আত্মগঠনে ব্রতী হতেই হবে। নতুবা বৃথা পর্যবসিত হবে তার এ জীবন। ইমাম হাসান (আ.) দুনিয়াবি বাদশাহিকে নির্দ্বিধায় ত্যাগ করে বেহেশতের সর্দার হয়ে প্রমাণ করেছেন যে, পার্থিব জগৎ আর দেহবিলাসই মানুষের প্রকৃত মর্যাদা নয়। তার স্থান পরাপ্রাকৃতিক, ঊর্ধ্বজাগতিক। তাই তাকে সেভাবেই গড়ে তুলতে হবে নিজেকে। চলতে হবে মানবিক পথে, মানবীয় গুণাবলির শক্তিতে।

আরবাইন : ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শাহাদাতের স্মরণ

রাশিদ রিয়াজ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিবছর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শাহাদাতের দিন থেকে চল্লিশ দিন পর তাঁর কারবালার মাজারে ভক্ত অনুসারীরা ছুটে যান। কিন্তু কেন? ছকে বাঁধা জীবনের মোহ থেকে মুক্তি পেতে সত্যের পথে ধাবিত হয়ে চিরন্তন অনুসারী হিসেবেই তাঁরা সেখানে যান। মিশে যান সমাবেশে। এ দিবসটি পালনই হলো আরবাইন। 'আরবাইন' আরবি শব্দ ও এর মানে হচ্ছে চল্লিশ। ফারসি শব্দ 'চেহলুম' বা উর্দু 'চেহলাম' শব্দের অর্থও চল্লিশ যা বাংলায় চল্লিশা হিসেবে সুপরিচিত। এ দিন কারবালায় ইমাম হোসাইনের মাজারটি ইসলামের অনুসারীদের অংশগ্রহণে এক সংগ্রামী কাফেলায় পরিণত হয়। তাঁরা আসেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে। সত্য প্রতিষ্ঠায় আরো বেগবান হওয়ার শপথ নিয়ে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন নিজেদের গন্তব্যে। প্রখর খরতাপ, কখনো বালু ঝড়, অজানা শঙ্কা কোনো কিছুই তাঁদের পথ আটকে রাখতে পারে না। পায়ে হেঁটে তাঁরা অবিরাম গন্তব্যে ছোটেন। পিপাসা, ক্ষুধা, পায়ে ফোস্কা পড়ে গেলেও তাঁরা ক্ষণিক বিশ্রাম নেন তারপর ফের রওয়ানা দেন। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর কারবালার প্রান্তরে সেই বিয়োগান্তক ঘটনার পর মানুষ হক ও বাতিলের পার্থক্য ধরে রেখে হকের পক্ষেই অবস্থান বুঝাতে এই কাফেলায় যোগ দেন। বরং তাঁদের মনে থাকে এ গর্ব যে, তাঁরা হকের পথ অনুসরণ করেই যাঁর যাঁর দেশ থেকে এসে মানবস্রোতে মিশে গেছেন। ইরান, লেবানন, আজারবাইজান, পাকিস্তান, ভারত, তুরস্ক, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ইউরোপের কোনো কোনো দেশ থেকে তাঁরা আসেন এবং অনিবার্য এক আদর্শিক শপথে বলীয়ান হয়ে ওঠেন। ইরাকের নাজাফ থেকে কারবালা ৫০ মাইলের এ পথযাত্রা নির্ধারিত হয়ে থাকে ১৪শ' পোলের মাধ্যমে। এধরনের পোলকে গন্তব্য ধরে শত সহস্র মানুষ আগাতে থাকেন এক মিলন মেলায়। প্রায় দুই দিন ও দুই রাত্রির যাত্রা পথে থেমে থেমে ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়েন, ফের যাত্রা শুরু করেন ধীর স্থির এক লক্ষ্যপাণে।

আরবাইনের এক সপ্তাহ আগে থেকেই মূলত এসব নারী ও পুরুষ বা তাঁদের সঙ্গে শিশুরা, এমনকি বয়স্করা পথ চলতে শুরু করেন প্রস্তুতি পর্বের অংশ হিসেবে। ইমামের অতুলনীয় বীরত্ব, সাহসিকতা ও আপোসহীনতাই তাঁদের কাছে পার্থিব প্রস্তুতির অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে, যা তাঁদের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে ধাবিত করে আরবাইনে। অসাধারণ সংকল্প নিয়ে তাঁরা দিন রাত অবিরাম এক শহর থেকে অন্য শহরে নির্বিঘ্নে ও নিরবচ্ছিন্ন পথে হাঁটেন, সংকল্পগুলো ধরে রাখেন। এদেরই একজন পাকিস্তানের গিলগিট থেকে আসা রাগিব হুসেইন বলেন আরবাইনে তাঁর জীবন পাল্টে যাওয়া অভিজ্ঞতার কথা। তুরস্কের 'আনাদোলু এজেন্সি'কে বলেন, 'ভিন্ন জাতি, সংস্কৃতি, ভাষাভাষির মানুষ এক মোহনায় এসে মিলিত হচ্ছে এবং কি এক ঐক্য আমাদের একীভূত করছে যা সব ধরনের শয়তানি কার্যক্রম থেকে মানবতাকে রক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। এদৃশ্য আমি কখনোই ভুলব না। এ এক আবেগময় অভিজ্ঞতা।' আজারবাইজান থেকে এসেছিলেন আন্না ফাতেমেহ। তিনি বলেন, 'ধর্মীয় সমাবেশের চেয়ে আরবাইন অতিরিক্ত কিছু। গত তিন বছর ধরে আমি আরবাইনে যোগ দিচ্ছি। প্রতিবারই নিজেকে চেতনাগত

দিক থেকে সমৃদ্ধ করছি এবং তা বিস্ময়কর। এই পদযাত্রা প্রত্যেককে সত্য, ন্যায় বিচার ও স্বাধীনতা চিনে নিতে সাহায্য করে। মানবতার জন্যই আমরা এতে যোগ দেই।'

অনেক অমুসলিম আরবাইনে যোগ দেন। ২০১৯ সালে ব্রিটেনের এক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ৩০ বছরের জেমস বলেন, 'দুই বছর ধরে পরিকল্পনার পর আমি আরবাইনে যোগ দিয়েছি।' একই বছর যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টন থেকে আলী মেহেদি আরবাইনে এসে বলেন, 'কারবালা সত্য সম্পর্কে বলতে শিক্ষা দেয় এবং যারা নির্বাক তাদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে ও সোচ্চার হতে সাহায্য করে। দুর্বল, শক্তিহীন ও নিপীড়িতদের সমর্থনে এই পদযাত্রা এক চিৎকার।' জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর হুমকি সত্ত্বেও আরবাইনে যোগ দেয়া মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। 'আনাদোলু'কে ইরানের ইসলামি চিন্তাবিদ শেখ জারিয়ে খোরমিজি আরবাইনের পদযাত্রায় হাঁটতে হাঁটতে বলেন, 'কারবালার উত্তরাধিকার হলো সত্য বনাম মিথ্যা, সঠিক বনাম পেশীশক্তি, ন্যায়বিচার বনাম নিপীড়ন ও গৌরব বনাম ঘৃণার।'

নাজাফ থেকে আরবাইনের পথচলা শুরু হওয়ার সপ্তাহ খানেক আগে রাস্তায় নেমে আসেন বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মানুষ। স্থানীয়রা তাঁদের প্রয়োজনে স্টল খোলেন, পানীয়, মিস্টি ও খাবার নিয়ে অতিথিদের আমন্ত্রণ জানান। নাজাফ থেকে কারবালা পর্যন্ত পথের মোড়ে মোড়ে স্থানীয় বাসিন্দারা একইভাবে স্বাগত জানান, মসজিদগুলোতে তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত পথযাত্রীদের খোঁজ নেন। প্রচুর পরিমাণে অতিথিদের জন্য খাবার তৈরি করেন তাঁরা। ভেড়ার মাংস, গ্রিল করা মাছ, সবজি, রুটি, ভাত আরবাইনে অংশ নেয়াদের খাওয়াতে পেরে স্থানীয়রা পরম তৃপ্তি লাভ করেন। তাঁরা তাঁবু গেড়ে অপেক্ষায় থাকেন মানুষের, কালো ইরাকি চা, উলের কম্বল নিয়ে আগ্রহ নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন। কারো প্রয়োজন মেটাতে পারলে তাঁরা যারপর নাই খুশি হন। মোবাইল বাথরুম, টয়লেটের ব্যবস্থা থাকে যাতে দ্রুত গোসল সেরে নেয়া যায়। থাকে অ্যাম্বুলেন্স জরুরি চিকিৎসার জন্য। মরুভূমির এই পদযাত্রায় দিনে প্রখর খরতাপ আর রাতে কঠিন ঠাণ্ডা। লেবানন থেকে আসা হুসেইন

আল-হাদি বলেন, অপরিচিত মেহমানদের সেবা করে তাঁরা মেহমানদারির এক নতুন সংজ্ঞা তৈরি করেন। আতিথেয়তার ধারণা পাল্টে যায়। অতিথিদের জন্য প্রয়োজন মেটাতে পেরে নিজে সম্মানিত হন। পথের বাঁকে দেখা যায় কোনো দম্পতি খেঁজুর নিয়ে অপেক্ষা করছেন যদি অতিথিকে আপ্যায়ন করার সুযোগ মেলে। এমনি এক দম্পতি জানান, 'প্রতিটি মাসে অল্প অল্প করে সাধ্যমত কিছু সঞ্চয় করেছি যাতে তা আরবাইনে আগতদের জন্য খরচ করতে পারি। অতিথিরা যেন কোনো অভিযোগ করার সুযোগ না পান।' যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ হলেও, তাঁদের আয়ের উৎস স্বাভাবিক হয়ে না এলেও তাঁরা এমন আতিথেয়তা থেকে বিরত থাকতে পারেন না। অন্তত দশটি দিন ইরাকি নাগরিকরা আরবাইনে আগতদের জন্য সেবা দিতে তাঁদের হৃদয়ের দরজা খুলে দেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আরবাইনে মানুষের যোগ দেয়ার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠলেও আন্তর্জাতিক মূলধারার মিডিয়ার কাছে তা উপযুক্ত মনোযোগ পাচ্ছে না। কিন্তু কেন? এবং এটি বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এক সময় ইরাকে আহলে বাইতের অনুসারীরা খালি পায়ে আরবাইনে যোগ দিতেন। ইতিহাসের কোনো এক সন্ধিক্ষণে তা বাদ যায়। ১শ' বছর আগে তা ফের চালু হয়। কিন্তু ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের শাসনামলে (১৯৭৯-২০০৩) আরবাইন নিষিদ্ধ ছিল। যাঁরা লুকিয়ে আরবাইনে অংশ নিতেন তাঁদেরকে হিংস্র প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সাদ্দাম সরকারের আমলে কারবালা অভিমুখে এধরনের পদযাত্রায় সামিল হওয়া কারো কারো পা কেটে নেয়ার মতো নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটেছে। এরপর রাতের অন্ধকারে কিংবা বিকল্প পথে খেঁজুর বাগানের মধ্য দিয়ে সন্তর্পণে আরবাইনে যোগ দিতেন অনেকে। সাদ্দামের পতনের পর ফের লোকজন দেশটির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খালি পায়ে কারবালা অভিমুখে আরবাইনে যোগ দিতে শুরু করেন। আরবাইনের দিনে বা এ ধর্মীয় যাত্রার শেষ দিনে তাঁরা কারবালায় পৌঁছে যান। আরবাইনের সময় এলেই ইরাকের সকল রাস্তার গন্তব্য যেন আরবাইনমুখী হয়ে পড়ে। এখন বছরে ২০ মিলিয়ন মানুষ আরবাইনে যোগ দিচ্ছেন। গত তিরিশ বছর ধরে ইরাকের জনগণ অবরোধ, স্বৈরাচারী সারকার, যুদ্ধ, বিদেশি দখলদারিত্ব ও আইএস জঙ্গি গোষ্ঠীর সন্ত্রাস মোকাবেলা করে আসছে। ইরাকের দক্ষিণ অঞ্চলে সিংহভাগ শিয়ারা বাস করেন। ওই অঞ্চলের আল-ফাও এলাকা থেকে ৬৬৭ কিলোমিটার হেঁটে শিয়ারা আরবাইনে যোগ দিতেন। ২৪ মুহররম থেকে তাঁরা যাত্রা শুরু করতেন এবং ২৬ দিন তাঁরা একটানা হেঁটে আরবাইনের আগেই কারবালায় পৌঁছতেন। বিভিন্ন শহরের মানুষ তখন হিল্লাহ শহর দিয়েই আরবাইনে যোগ দিতেন। তবে ইরাকের বাইরে অন্য যেসব দেশ থেকে যাঁরা আরবাইনে যোগ দিতে আসেন তাঁরা তা শুরু করেন নাজাফ থেকে। এখানেই হযরত আলী (আ.)-এর মাজার। নাজাফ থেকে কারবালার দূরত্ব ৮০ কিলোমিটার। আরবাইনের দিন যাঁরা কারবালায় পৌঁছতে চান তাঁদের জন্য সফর মাসের ১৬ তারিখে যাত্রা শুরু করা ভালো। যাত্রাপথে বিশ্রাম ও খাবার গ্রহণের সময় 'মওকেব' হিসেবে পরিচিত। এসময় অনেকে নামাজ আদায় করে নেন। ইরাকি নাগরিকরা 'মওকেব'-এর আয়োজন করে থাকেন। ধর্মীয় দিক থেকে মূল্যবান হওয়া ছাড়াও আরবাইনের বিভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে।

প্রথমত, আরবাইন বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থার বিপরীতে একটি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা তৈরি করে। ধর্ম এবং এর মূল্যবোধ ও চিহ্নগুলো রক্ষায় বিপুল সংখ্যক ধর্মীয় ও অনুপ্রাণিত লোক– যাঁরা অনুসারী হিসেবে অস্তিত্বের জানান দেন। এ এক নতুন বিকল্প শক্তির উৎস যা অন্য কোনো উপায়ে অনুকরণ করা যায় না এবং ফলাফলগুলো ইসলামি বিশ্বের স্বার্থ ও নীতিগুলোর অগ্রগতির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আরবাইন যাত্রায় অংশ যাঁরা নেন তাঁদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক সুবিধা ও সীমাহীন সম্ভাব্য শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে যা তাঁকে যে কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করার ও প্রতিরোধের সক্ষমতা তৈরি করে।

দ্বিতীয়ত, আরবাইন বিশ্বমানবের কাছে একটি কাঙ্ক্ষিত জীবন যাত্রার আদর্শ উপস্থাপন করে। ক্ষণিকের এই জীবনে কয়েক দিন মানুষ তার সমস্ত পার্থিব সম্পদ ত্যাগ করে ক্ষতিকর প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি এবং একে অপরকে সাহায্য করার জন্য সময়কে মূল্যবান করে তোলে। মানুষ পার্থিব সম্পদ জমানোর সন্ধানে নয় বরং প্রত্যেকে আরো আধ্যাত্মিকতা অর্জনের চেষ্টা করে। মানুষ একে অপরের সেবা করতে পছন্দ করে এবং অন্যকে সহায়তা করার জন্য প্রতিযোগিতা করে। আসলে এটি বলা যেতে পারে যে, আরবাইন মানুষকে এক নতুন জীবন দান করে।

তৃতীয়ত, আরবাইন মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞান এবং মননশীলতার বৃদ্ধি ঘটায়। আরবাইন চলাকালে মানুষের মাঝে রাজনীতি, সংস্কৃতি, সামাজিক নানা ইস্যুতে তথ্য ও ভাবের বিনিময় হয়। এতে সবাই ধর্মীয় জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধির সুযোগ পায়। আরবাইন পদযাত্রায় এ দিকটি ইমাম হোসাইন (আ.)-এর কারবালায় যাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেমনটি তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে নামাজে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি দাও।'

চতুর্থত, আরবাইন যাত্রা আধ্যাত্মিকতাকে আরো গভীর করে। এবং তা অর্জনের উপায় হিসেবে ইসলামি শিক্ষাগুলোর সম্মিলিত আচার-আচরণ ও ইবাদতের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। ব্যক্তিগত ইবাদতের পাশাপাশি সম্মিলিতভাবে ইবাদতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক মিলনকে আরো বাড়িয়ে দেয়। সম্মিলিত এ আন্দোলনে নির্জন প্রার্থনায় নিজেকে সঁপে দেয়া ও শোক করা, দান করা, তাপ-তৃষ্ণা এড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আরবাইন যাত্রীরা আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ লাভ করেন। ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে কারবালায় যে যাত্রা শুরু করেছিলেন তার স্মরণে লাখো মানুষ এখন আরবাইনে যোগ দেন। ইমাম হোসাইন অসত্য ও জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের কাছে এক আদর্শিক প্রতীক হয়ে উঠেছে। ন্যায়বিচার ও আত্মমর্যাদাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তাঁরা এক অনুপ্রেরণার উৎস সন্ধানে কারবালার প্রান্তরে ধাবিত হন। কারবালার যুদ্ধ, ইমাম হোসাইন (আ.), তাঁর জীবন ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট এক ধারণা নিয়ে ফেরেন তাঁরা।

ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর জীবন ও কর্ম

মো. আশিফুর রহমান

ভূমিকা : আহলে বাইতের ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদিক (আ.) ১৪৮ হিজরিতে পবিত্র মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৩৪ বছর ইমামতের দায়িত্ব পালন করেন।

পিতামাতা : ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর পিতার নাম ছিল ইমাম মুহাম্মাদ আল বাকের (আ.) ও মাতার নাম ছিল হযরত ফারওয়া।

কুনিয়া ও উপাধি : ইমামের কুনিয়া ছিল আবু আবদুল্লাহ। কোনো কোনো সূত্রে তাঁর কুনিয়া আবু ইসমাইল (যেহেতু তাঁর বড় ছেলের নাম ছিল ইসমাইল) ও আবু মূসা (তাঁর জীবিত পুত্র মূসা কাযিম) হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধি হচ্ছে আস-সাদিক যার অর্থ সত্যবাদী। একটি হাদিস অনুসারে, মহানবী (সা.) স্বয়ং তাঁর এই উপাধি বলে গিয়েছিলেন যাতে 'জাফর আলকায্যাব' থেকে পৃথক করা যায়।– সাদুক, কামালুদ্দীন, পৃ. ৩১৯

যাহোক, ইতিহাসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ইমাম সাদিক (আ.) এই উপাধি পেয়েছিলেন এজন্য যে, তিনি তাঁর সময়ের যে কোনো বিদ্রোহ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। ওই সময়ে যে কেউ শাসকদের বিরুদ্ধে লোকদেরকে জমায়েত করত ও বিদ্রোহে প্ররোচনা দিত তাদেরকে 'কায্যাব' বলা হতো।

এই উপাধি কেবল তাঁর জন্যই ব্যবহৃত হতো। কয়েকজন সুন্নি পণ্ডিত, যেমন মালিক বিন আনাস, আহমাদ বিন হাম্বাল এবং আল জাহিয ইমাম জাফর সাদিককে এই উপাধি দ্বারাই উল্লেখ করেছেন।

ইমাম সাদিকের অন্যান্য উপাধির মধ্যে রয়েছে আস-সাবির, আত-তাহির এবং আল-ফাযিল।

জীবনকাল

ইমাম সাদিক (আ.) তাঁর জীবনের বারো বছর তাঁর দাদা ও ত্রিশ বছর তাঁর পিতার সান্নিধ্যে কাটান। ইমাম জাফর সাদিক (আ.) দশ জন উমাইয়্যা খলিফা ও দুই জন আব্বাসী খলিফার সমসাময়িক ছিলেন।

ইমাম সাদিক (আ.) তাঁর পিতার সাথে সিরিয়ায় গমন করেন যখন হিশাম ইবনে আবদুল মালিক ইমাম বাকের (আ.)-কে সিরিয়া ডেকে পাঠায়।

ইমাম সাদিক (আ.)-এর ইমামতকালে উমাইয়্যা খেলাফত পতনোন্মুখ হয়েছিল এবং অবশেষে পতনও ঘটে আর আব্বাসীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। শাসকবর্গের দুর্বলতা ইমামের শিক্ষা বিস্তারে সুযোগ সৃষ্টি করে। তুলনামূলকভাবে এই উন্মুক্ত অবস্থা দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি অংশে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এর আগে ইমাম ও তাঁর অনুসারীরা উমাইয়্যাদের পক্ষ থেকে ভীষণ চাপের মধ্যে ছিলেন। মুহাম্মাদ আন-নাফসে যাকীয়াহ এবং তাঁর ভাই ইবরাহীমের বিদ্রোহের পরও ইমাম প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিলেন।

ইমাম জাফর সাদিকের ইমামতকাল ৩৪ বছর স্থায়ী হয়েছিল। মানসুর দাওয়ানিকির শাসনকালের দশ বছর পর ইমাম শহীদ হন। ইমাম সাদিক খলিফা মানসূর কর্তৃক ইরাকে নীত হন এবং সেখানে কিছুকাল বসবাস করতে বাধ্য হন।

ইমামতের প্রমাণ

কয়েক ব্যক্তি ইমাম বাকের (আ.)-এর নিকট থেকে তাঁর সন্তান ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর জন্য ইমামতের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করে বর্ণনা করেছেন– যাঁদের মধ্যে রয়েছেন হিশাম বিন সালিম, আবুল সাবাহ আল কানানী, জাবির ইবনে ইয়াযীদ আল জুফী এবং আবদুল আলা মাওলা আল শাম।

শেখ মুফীদ বলেন, ইমাম বাকের (আ.) কর্তৃক ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর ইমামতের বিষয়টি বলে যাওয়া ছাড়াও তাঁর ভাইদের, তাঁর চাচাতো ভাইদের ও অন্য মানুষদের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর জ্ঞানগত প্রতিভা, ধার্মিকতা এবং ধর্মপরায়ণতা ইত্যাদি তাঁর ইমামতের প্রমাণ বহন করে।

প্রতিনিধি নিয়োগ

যেহেতু আহলে বাইতের অনুসারী মুসলমানরা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করত এবং ইমামের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করাটা তাদের জন্য খুব কষ্টকর ছিল তাই ইমাম সাদিক (আ.) বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগের পদ্ধতি চালু করেন যারা খুমস, যাকাত ও অন্যান্য অনুদান ও উপঢৌকন ইমামের কাছে পৌঁছে দিতেন। তারা বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণের প্রশ্নসমূহ ইমামদের

কাছে নিয়ে আসতেন এবং সেগুলোর জবাবও জনগণের কাছে পৌঁছে দিতেন।– জাব্বারী, সাজমান-ই ওয়াকালাত-ই আইম্মা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮০, ৩২০, ৩২২

পরবর্তীকালে এই প্রতিনিধি নিয়োগের ধারা আলী বিন মুহাম্মাদ আল সামারীর মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যিনি ইমাম মাহদী (আ.)-এর চতুর্থ সরাসরি প্রতিনিধি ছিলেন।– জাব্বারী, বাররাসীয়ে সাজমানে দাওয়াতি আব্বাসীয়ান, পৃ. ৭৫-১০৪

গুলাতের বিরোধিতা

ইমাম বাকের (আ.) ও ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর সময় গুলাতরা তাদের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করে ফেলে। তারা বিশ্বাস করত ইমামরা খোদা অথবা নবী। ইমাম সাদিক (আ.) শক্তভাবে এই মতবাদের বিরোধিতা করেন। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে গুলাতদের সাথে মিশতে নিষেধ করতেন এবং তাদেরকে কাফির হিসেবে ঘোষণা করেন। তাদের সম্পর্কে ইমাম বলেন, 'তাদের সাথে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করো না, তাদের সাথে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করো না এবং তাদের সাথে মুসাফাহা করো না।' ইমাম হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন : 'সতর্ক থেক, গুলাতরা যেন তোমাদের যুবকদেরকে বিপথে না নিতে পারে। তারা আল্লাহর সবচেয়ে নিকৃষ্ট শত্রু। তারা আল্লাহকে তুচ্ছ গণ্য করে, কিন্তু আল্লাহর বান্দাদের ওপর প্রভুত্বের বৈশিষ্ট্য আরোপ করে।'– তূসী, আল আমালী, পৃ. ৬৫০

জ্ঞানগত আন্দোলন

উমাইয়্যাদের দুর্বলতার কারণে ইমাম জাফর সাদিক (আ.) শিক্ষাদান ও সামাজিক কর্মকাণ্ড করার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক সুযোগ লাভ করেন। ইমামদের সময়ে এমনটি খুবই দুর্লভ বিষয় ছিল। আর তাই আহলে বাইতের অধিকাংশ হাদিস ইমাম জাফর সাদিক (আ.) হতে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে হাজার হাইসামীর অভিমত অনুযায়ী, মানুষ তাঁর নিকট থেকে বিপুল পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করে ও প্রচার করে এবং তাঁর সুখ্যাতি বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। আল-জাহিয বলেন যে, তাঁর জ্ঞান এবং ফিকাহ্শাস্ত্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। আল হাসান বিন আলী আল ওয়াসসা বর্ণনা করেন যে, কুফার মসজিদে নয়শ লোক ইমাম জাফর সাদিক (আ.) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।– নাজাশী, রিজাল আল নাজাশী, পৃ. ১২

আহলে বাইতের মাযহাব

আহলে বাইতের অধিকাংশ হাদিস, তা ফিকাহ বিষয়ে হোক, অথবা ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত, ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁর নিকট থেকে হাদিস বর্ণনাকারীদের সংখ্যা চার হাজার পর্যন্ত বলা হয়েছে (ইরবিলির অভিমত)– যা অন্য যে কোনো ইমাম থেকে বর্ণিত হাদিসের চেয়ে অনেক বেশি। আবান ইবনে তাগলিবের মতে, আহলে বাইতের অনুসারীরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো বাণীর বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলে সেক্ষেত্রে আলী (আ.)-এর বাণী দেখত, তেমনিভাবে যখন ইমাম আলী (আ.)-এর বাণীর বিষয়ে মতানৈক্য করত তখন তারা ইমাম সাদিক (আ.)-এর বাণীর দিকে লক্ষ্য করত।

ইসলামি শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারে ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য আহলে বাইতের অনুসারীদেরকে জাফরী মাযহাবের অনুসারী বলা হয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপ ও বিতর্ক

আহলে বাইতের হাদিস সংকলনে কিছু সংখ্যক পারস্পরিক সংলাপ ও বিতর্কের বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে যা ইমাম সাদিক (আ.) এবং অন্যান্য মাযহাবের পণ্ডিত এবং কতিপয় নাস্তিকের সাথে সংঘটিত হয়েছিল। কিছুসংখ্যক বিতর্কে ইমামের শিষ্যগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ইমাম তা অবলোকন করেছিলেন। কখনও কখনও ইমাম নিজেই বিতর্কে অংশ নিতেন।– কুলাইনী, আল-কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯, ৮০, ১৭১-১৭৩

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দামেশকের একজন পণ্ডিতের সাথে ইমামের শিষ্যদের বিতর্কের অনুরোধ করা হলে ইমাম জাফর সাদিক (আ.) হিশাম বিন সালিমকে ধর্মতত্ত্বের বিষয়ে তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দেন। –প্রাগুক্ত

অন্য একটি ঘটনায় দেখা যায়, এক ব্যক্তি তাঁকে বিতর্কের আহ্বান জানালে ইমাম প্রথমে তাঁর শিষ্যের সাথে তাকে বিতর্ক করার জন্য বলেন। সেই ব্যক্তি হুমরান বিন আয়ানের সাথে কোরআনের বিষয়ে, আবান বিন তাগলিবের সাথে আরবি সাহিত্যের বিষয়ে, যুরারাহর সাথে ফিকাহ বিষয়ে এবং মুমিন তাক ও হিশাম বিন সালিমের সাথে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে বিতর্ক করে এবং তাদের সকলের কাছে পরাজিত হয়।– কাশশী, রিজাল, পৃ. ২৭৫-২৭৭

আহমাদ বিন আলী আল তাবরিযী ইমাম সাদিক (আ.)-এর কিছুসংখ্যক বিতর্কের সংকলন করেন যেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়ে একজন নাস্তিকের সাথে বিতর্ক,

২. আবু শাকির আল দায়সানির সাথে আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়ে বিতর্ক;

৩. ইবনে আবিল আওযার সাথে আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়ে বিতর্ক;

৪. ইবনে আবিল আওযার সাথে বিশ্বের সৃষ্টি নিয়ে বিতর্ক;

৫. একজন নাস্তিকের সাথে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ বিতর্ক;

৬. ইমাম আবু হানিফার সাথে উসূলে ফিকহ্ নিয়ে বিতর্ক;

৭. কয়েকজন মুতাযিলী পণ্ডিতের সাথে শাসককে বেছে নেয়া ও কিছু ধর্মীয় নিয়ম-কানুন নিয়ে বিতর্ক।

এই বিতর্কগুলোর অধিকাংশই আল্লামা তাবারসীর 'আল-ইহতিজাজ' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে ৩৩১ পৃষ্ঠা থেকে ৩৬৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড

ইমাম সাদিক (আ.)-এর জীবনী পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন এবং এই অবস্থান উমাইয়্যা ও আব্বাসী উভয় শাসনামলে একই রকম ছিল। যদিও তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকতেন, কিন্তু সমাজের প্রতি এবং এর গন্তব্য সম্পর্কে খুবই মনোযোগী ছিলেন। তিনি শাসকদেরকে শাসনকার্যে ন্যায়নীতি বজায় রাখার উপদেশ দিতেন, মানুষের সাথে পরামর্শ এবং তাদের অনুরোধ রক্ষার জন্য উপদেশ দিতেন।

সেই সময়ে উমাইয়্যা শাসকদের দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি বিদ্রোহ ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থেকে দূরে থাকতেন। শাহরেস্তানীর মতে, আবু মুসলিম খোরাসানী ইবরাহীম আল ইমামের মৃত্যুর পর ইমাম সাদিকের কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করেন এই কথা বলে যে, তিনিই খেলাফতের সবচেয়ে যোগ্য এবং তিনি যেন খেলাফতের পদ গ্রহণ করেন। ইমাম এর জবাবে লিখেন : 'তুমি আমার অন্যতম সাহায্যকারী নও, আর এই সময়টিও আমার নয়।'– শাহরিস্তানী, আল মিলাল ওয়ান নিহাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৯

আবু সালামাও ইমামের নিকট এই রকম পত্র প্রেরণ করেন আর ইমাম তা পুড়িয়ে ফেলেন।– মাসউদী, মুরুযুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৪

ইমাম সাদিক (আ.) তাঁর চাচা যায়েদ বিন আলীর সাথে বিদ্রোহে যোগ দেন নি। একটি হাদিস থেকে জানা যায়, যথেষ্ট সংখ্যক বিশ্বস্ত সমর্থক না থাকায় ইমাম বিদ্রোহগুলোতে যোগ দেন নি।– ইবনে শাহরাশুব, মানাকিব আল আবি তালিব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৭

আবদুল্লাহ আল মাহাযের সাথে মতানৈক্য

উমাইয়্যা শাসনের শেষের দিকে বনু হাশিমের কতিপয় ব্যক্তি-যাদের মধ্যে আবদুল্লাহ আল মাহায ও তার সন্তানও ছিল-এবং আস সাফফাহ এবং আল মানসূর আবওয়া নামক স্থানে জমায়েত হয়েছিল নিজেদের মধ্যে কারো হাতে বাইয়াত করার জন্য। সেই সমাবেশে আবদুল্লাহ তার সন্তানকে 'আল মাহদী' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং অন্যদেরকে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণের আহ্বান জানায়। যখন ইমাম সাদিক (আ.) তাদের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত হন তখন তিনি আবদুল্লাহকে বলেন, 'যদি তুমি তোমার সন্তানকে মাহদী মনে কর (তাহলে তুমি ভুল করেছ, আসলে) সে আল মাহদী নয় এবং আল মাহদীর আগমনের সময় এখনও হয় নি।' আবদুল্লাহ একথা শুনে রাগান্বিত হয় এবং ইমামকে হিংসার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। ইমাম সাদিক (আ.) কসম করে বলেন, তাঁর কথা হিংসাপ্রসূত নয় এবং তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, আল সাফফাহ ও আল মানসূর শাসক হবে এবং আবদুল্লাহ ও তার সন্তানকে হত্যা করা হবে।– আবুল ফারায আল-ইসফাহানী, মাকতালুত তালিবিয়্যীন, পৃ. ১৮৫-১৮৬

খলিফাদের সাথে সম্পর্ক

যদিও ইমাম সাদিক (আ.) তাঁর সময়ের খলিফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে অস্বীকার করেন, কিন্তু খলিফাদের সাথে তাঁর সম্পর্ক মোটেও ভালো ছিল না। একবার হজের মৌসুমে তিনি আহলে বাইতকে আল্লাহর মনোনীত হিসেবে ঘোষণা করেন এবং খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিকের আহলে বাইতের প্রতি শত্রুতার কথা উল্লেখ করেন।– মাজলিসী, বিহারুল আনওয়ার, ৪৬তম খণ্ড, পৃ. ৩০৬

একবার আব্বাসী খলিফা মানসূর দাওয়ানিকি অন্য লোকেরা যেমন তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য যায় ইমামকেও তেমন তার সাথে সাক্ষাৎ করা জন্য যাওয়ার আহ্বান জানালে ইমাম লিখে পাঠান– তোমাকে ভয় করার জন্য আমাদের তেমন কিছু নেই, পরকালে তোমার কিছু নেই যার জন্য তোমার কাছে আমাদের কিছু আশা থাকতে পারে, আর তুমি নেয়ামতের মধ্যেও নও যার জন্য তোমাকে অভিনন্দন জানানো যায়...– মাজলিসী, বিহারুল আনওয়ার, ৪৭তম খণ্ড, পৃ. ১৮৪

ইমাম সাদিক (আ.)-এর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া

একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, যখন হাসান বিন যায়েদ মক্কা ও মদীনার গভর্নর ছিল সেসময় একবার ইমাম সাদিক (আ.)-এর বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আগুনে বাড়ির দরজা ও করিডোর পুড়ে যায়। ইমাম সাদিক (আ.) আগুনের ভেতর দিয়ে এ কথা বলতে বলতে বের হয়ে আসেন : 'আমি পৃথিবীর মূলের সন্তান (অর্থাৎ ইসমাইল আ.-এর সন্তান); আমি আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীমের সন্তান।'–

কুলাইনী, আল-কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৩

দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কিছুটা সময় বাদে পুরো সময়টি ইমাম উমাইয়্যা ও আব্বাসী খলিফাদের কঠোর নজরদারির মধ্যে ছিলেন। ইমামের ওপর রাজনৈতিক চাপ চরমে পৌঁছেছিল।– জাফারীয়ান, হায়াতি ফিকরী সিয়াসীয়ে ইমামানে শিয়া, পৃ. ৪৩৫

কিছু কিছু বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, মানসূরের গুপ্তচররা ইমামের সাথে যেসব ব্যক্তি যোগাযোগ রাখত তাদেরকে নির্যাতন করত, এমনকি অনেককে হত্যাও করত। এতে ইমাম ও তাঁর অনুসারীদেরকে খুব সতর্ক হয়ে চলতে হতো।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক কিছু বর্ণিত হয়েছে, যেমন তাঁর বদান্যতা, ইবাদত-বন্দেগি, কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি। মালিকি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা মালিক বিন আনাস বর্ণনা করেন যে, যখনই তিনি ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর সাথে দেখা করতে যেতেন তখন তাঁকে তিনটি অবস্থার যে কোনো একটি অবস্থায় পেতেন– নামায পড়া, রোযা রাখা অথবা আল্লাহর যিকির করা।– মাজলিসী, বিহারুল আনওয়ার, ৪৭তম খণ্ড, পৃ. ১৬

বর্ণিত হয়েছে যে, একবার ইমাম একজন ভিক্ষুককে চারশ' দিরহাম ভিক্ষা দেন। ভিক্ষুকটি ইমামের প্রশংসা করলে ইমাম তাঁর হাতের আংটি সেই ভিক্ষুককে দিয়ে দেন যার মূল্য ছিল দশ হাজার দিরহাম।– মাজলিসী, বিহারুল আনওয়ার ৪৭তম খণ্ড, পৃ. ৬১

বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম সবসময় কিছু রুটি ও মাংস এবং টাকা-পয়সা একটি থলেতে নিয়ে বিভিন্ন বাড়িতে যেতেন এবং তাদের মধ্যে সেগুলো বণ্টন করতেন। এসময় তিনি নিজের পরিচয় গোপন রাখতেন।– কুলাইনী, আল-কাফী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮

ইরাক সফর

আব্বাসী খলিফা সাফফাহ ও আল মানসূরের শাসনকালে ইমামকে কয়েকবার বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময়ে তিনি কারবালা, নাজাফ, কুফা ও হিরাও সফর করেন। মুহাম্মাদ বিন মারুফ আল হিলালির বর্ণনা অনুযায়ী, যখন ইমাম হিরা সফর করেন তখন বিপুল সংখ্যক লোকজন তাঁকে দেখার জন্য আসেন যে, তিনি কয়েকদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেও ইমামের সাথে দেখা করতে পারেননি।– মাজলিসী, বিহারুল আনওয়ার, ৪৭তম খণ্ড, পৃ. ৯৩-৯৪

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) কারবালায় ইমাম হোসাইন (আ.)-এর মাযার যিয়ারত করেন। কারবালায় হোসাইনিয়া নদীর তীরে একটি স্থাপনা রয়েছে যার মধ্যে ইমাম সাদিক (আ.)-এর একটি মেহরাব রয়েছে।– মুজাফফার, আল-ইমাম আস-সাদিক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩০

ইমাম আলী (আ.)-এর মাযার চিহ্নিত করা

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) ইমাম আলী (আ.)-এর মাযার যিয়ারত করেন এবং এই স্থানটি চিহ্নিত করেন যা পূর্বে অনুদ্ঘাটিত ছিল। আল্লামা কুলাইনির বক্তব্য অনুযায়ী, ইমাম সাদিক (আ.) ইয়াযীদ বিন আমর ইবনে তালহাকে নাজাফ ও হিরার মধ্যবর্তী একটি স্থানে নিয়ে যান এবং ইমাম আলী (আ.)-এর কবর দেখিয়ে দেন। শেইখ আত তূসীও বর্ণনা করেন যে, ইমাম জাফর আস সাদিক (আ.) ইমাম আলী (আ.)–এর মাযার যিয়ারত করেন, এর পাশে নামায আদায় করেন এবং ইউনুস বিন জাবইয়ানকে বলেন যে, সেটি আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)-এর মাযার।– তূসী, তাযহীবুল আহকাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫

একান্ত অনুসারী, ছাত্র এবং হাদিসের বর্ণনাকারী

শেইখ আত তূসী তাঁর 'রিজাল' গ্রন্থে ইমাম সাদিক (আ.) থেকে ৩২০০ হাদিস বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেছেন।– তূসী, ইখতিয়ার মাআরিফাতুর রিজাল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৯-৬৭৯

শেইখ মুফীদ তাঁর 'ইরশাদ' গ্রন্থে এই সংখ্যা ৪০০০ বলে উল্লেখ করেছেন। – মুফীদ, আল-ইরশাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৪

বলা হয়েছে যে, ইবনে উকদা ইমাম জাফর সাদিক (আ.) থেকে ৪০০০ হাদিস বর্ণনাকারীর নাম একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।– কুম্মী, আল-কিনা ওয়াল আলকাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮

ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্রের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো : ১. যুরারাহ বিন আয়ান, ২. বুরাইদ বিন মুয়াবিয়া, ৩. জামিল বিল দাররাজ, ৪. আবদুল্লাহ বিন মুসকান, ৫. আবদুল্লাহ বিন বুকাইর, ৬. হাম্মাদ বিন উসমান, ৭. হাম্মাদ বিন ঈসা, ৮. আবান বিন উসমান, ৯. আবদুল্লাহ বিন সিনান, ১০. আবু বাসীর, ১১. হিশাম বিন সালীম, ১২. হিশাম বিন আল-হাকাম।

ইমামের কয়েকজন একান্ত অনুসারী কিছু কিছু বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। যেমন- হামরান বিন আয়ান কোরআনভিত্তিক বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আবান বিন তাগলিব আরবি সাহিত্যে, যুরারাহ বিন আয়ান ফিকাহ্‌শাস্ত্রে, মুমিন আল তাক ও হিশাম বিন সালীম ধর্মতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ধর্মতত্ত্বে আরো বিশেষজ্ঞ ছিলেন হামরান বিন আয়ান, কায়েস আল মাসির এবং হিশাম বিন হাকাম।– পাকাচী, ইমাম জাফর সাদিক (আ.), পৃ. ১৯৯

কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সুন্নি পণ্ডিতও ইমাম সাদিক (আ.)-এর ছাত্র ছিলেন। শেইখ আস সাদুকের মতে, মালিক বিন আনাস বলেন, তিনি ইমাম সাদিক (আ.)-এর কাছে যেতেন এবং ইমাম থেকে হাদিস শুনতেন।– সাদুক, আল-খিসাল, পৃ. ১৬৮

মুয়াত্তা ইমাম মালিকের মধ্যে তিনি ইমাম সাদিক (আ.)-এর নিকট থেকে কয়েকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।– মালিক বিন আনাস, আল-মুয়াত্তা, পৃ. ১০

ইবনে হাজার হায়সামী বলেন, সুন্নি পণ্ডিত, যেমন : ইয়াহইয়া বিন সাইদ, ইবনে যুরাইহ, মালিক বিন আনাস, সুফইয়ান বিন উইয়াইনা, সুফইয়ান সাওরী, আবু হানিফা, শুবা বিন আল-হাজ্জাজ এবং আইয়্যুব আল সাখতিয়ানী ইমাম জাফর সাদিক (আ.) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।– ইবনে হাজার আল-হাইসামী, আল-সাওয়ায়েকুল মুহরিকাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮৬

বিখ্যাত হাদিসসমূহ

১. তাওহীদে মুফাজ্জাল : এই দীর্ঘ হাদিসটি চারটি বৈঠকে ইমাম কর্তৃক মুফাজ্জাল বিন উমরকে প্রদত্ত বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়ের সমষ্টি। এতে রয়েছে বিশ্বের সৃষ্টি, মানব সৃষ্টি, জীবজগতের অপূর্ব বর্ণনা, বেহেশত ও দোযখের বর্ণনা, মৃত্যুর বাস্তবতা, মানুষ সৃষ্টির পেছনের প্রজ্ঞা ইত্যাদি। যেহেতু এতে 'ফাক্কির ইয়া মুফাজ্জাল' অর্থাৎ চিন্তা কর, মুফাজ্জল বাক্যটি পুনঃপুন ব্যবহৃত হয়েছে সেজন্য এটি 'কিতাবে ফাক্কির' নামেও প্রসিদ্ধ হয়েছে।

২. হাদিসে ইনওয়ান আল বাসরী : এই হাদিসে ইমাম সাদিক (আ.) ইনওয়ান আল বাসরী নামের এক ব্যক্তিকে আত্মপরিশুদ্ধি, ধৈর্য এবং জ্ঞান সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন।– মাজলিসী, বিহারুল আনওয়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৪-২২৬

৩. উমাম বিন হানযালার মাকবূলা : এই হাদিস বিচারকার্য ও হাদিসের মধ্যকার বৈপরীত্য নিয়ে আলোচনা করেছে। এই হাদিসকে বেলায়াতে ফকীহর সমর্থক হিসেবে গণ্য করা হয়।– খোমেইনী, আল হুকুমা আল-ইসলামিয়াহ, পৃ. ১১৫-১২১

লিখিত কর্ম

কোনো কোনো সূত্রে কিছুসংখ্যক পত্র ও অসিয়তনামাকে ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এসবের মধ্য থেকে কয়েকটির নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা সম্ভব নয়, তবে কিছু কিছু বর্ণনা 'আল-কাফি'র মতো সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাই এগুলোর নির্ভরযোগ্যতাকে উচ্চ সম্ভাবনাযুক্ত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। নিচে এমন কিছু কর্মের উল্লেখ করা হলো :

১. নিজ সাথিদের কাছে ইমাম সাদিক (আ.)-এর চিঠি। 'আল-কাফি'তে উল্লিখিত এ পত্রে বিভিন্ন বিষয়ে ইমামের নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে।

২. রিসালাত শারাই আদ দীন, আমাশের সূত্রে বর্ণিত। এটি ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামের ব্যবহারিক শিক্ষা সংক্রান্ত– যা ইবনে বাবাওয়াই কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

৩. আর-রিসালাহ আল-আহওয়াযিয়া। এই পত্রটি আহওয়াযের গভর্নর নাজাশীর কাছে লেখা হয়েছিল। এটি শহীদে সানী'র 'কাশ্‌ফ আর-রিবা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. রিসালা আল-ইহলিলাযা। এটি ভারতীয় একজন পদার্থবিজ্ঞানীর সাথে স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে জাফর সাদিক (আ.)-এর আলোচনা। নাজাশী এটি 'বাদ আল খাল্‌ক ওয়াল হাস্ আলাল ইতিবার' শিরোনামে উল্লেখ করেছেন।

৫. তাফসীরে নুমানী।

ইমাম সাদিক (আ.)-এর বাণীসমূহের সংকলনও রয়েছে যা তাঁর ছাত্রদের দ্বারা সংকলিত হয়েছিল। এর মধ্য থেকে প্রকাশিত কয়েকটি হলো :

১. আল-জাফারিয়াত; মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-আশআস কর্তৃক সংকলিত।

২. নাস্‌র আদদুরার; এর বর্ণনাগুলো তুহাফুল উকূল গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. আল-হিকাম আল জাফারিয়া।

৪. সালমান বিন আইয়ুব কর্তৃক বর্ণিত কিছুসংখ্যক সংক্ষিপ্ত বাণী যেগুলো 'ফারায়েদুস সিমতাইন' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুন্নি আলেমদের দৃষ্টিতে ইমাম সাদিক (আ.)

সুন্নি পণ্ডিতদের কাছেও ইমাম সাদিক (আ.) উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। হযরত আবু হানিফা ইমাম জাফর সাদিককে সবচেয়ে জ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠ ফকীহ বলে বিবেচনা করতেন।– যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৬

প্রখ্যাত সুন্নি পণ্ডিত ইবনে আবিল হাদীদের মতে, আবু হানিফা, আহমদ বিন হাম্বাল এবং আশ শাফেয়ী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইমাম সাদিক (আ.)-এর ছাত্র ছিলেন।

শাহাদাত

১৪৮ হিজরিতে তৎকালীন খলিফার নির্দেশে ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-কে বিষ প্রয়োগ করা হয় এবং ইমাম শাহাদাত বরণ করেন।– মুফীদ, আল-ইরশাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮০

তাঁকে মদিনার জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

উত্তরসূরি

শাহাদাতের পূর্বে ইমাম জাফর সাদিক (আ.) তাঁর সন্তান ইমাম মূসা আল কাযিম (আ.)-কে তাঁর উত্তরাধিকারী ও পরবর্তী ইমাম হিসেবে ঘোষণা করেন।– কাশশী, রিজাল, পৃ. ২৮২-২৮৩

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবনের তাৎপর্য

শাহনাজ আরফিন

মানব জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই জগতে কোন না কোনভাবে পারিবারিক ব্যবস্থা চালু ছিল। পৃথিবীর প্রথম পরিবার গড়ে ওঠে হযরত আদম (আ.) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়ার মাধ্যমে। পরিবারের সদস্য প্রথমত তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজন ছিলেন। সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ এ পরিবারকে জান্নাতে বসবাস করতে দেন।

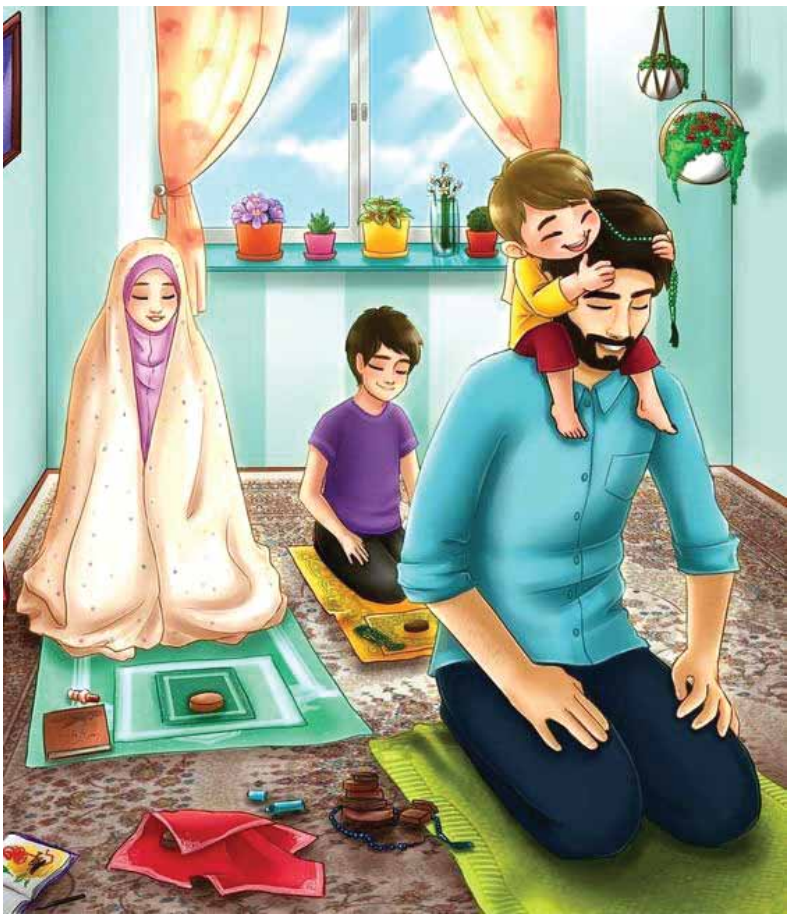

আল্লাহ পাক সূরা বাকারার ৩৫ নং আয়াতে বলেন : 'হে আদম! তুমি আর তোমার স্ত্রী দুজনে জান্নাতে বসবাস কর।' পরবর্তীকালে তাঁরা পৃথিবীতে আগমন করলেন এবং তাঁদের থেকে জন্ম নেয় তাঁদের সন্তান-সন্ততি। এভাবে পৃথিবীতে পরিবার ও পারিবারিক ব্যবস্থার সূচনা হয়।

অতীতের সব নবী ও রাসূলের জীবনে ও সময়কালে পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পরিবারের জন্য দোয়া করেছিলেন। সূরা বাকারার ১২৮ নং আয়াতে এসেছে : 'হে পরওয়ারদিগার! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ করো এবং আমাদের বংশধরদের থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি করো। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু।'

নিঃসন্দেহে, পরিবার হচ্ছে মানুষের বেড়ে ওঠার অন্যতম কেন্দ্র। মানুষের উন্নতি কিংবা তার অধঃপতন পরিবারের সুস্থতা ও পরিশুদ্ধতার ওপর নির্ভরশীল। আর সমাজের সুস্থতার জন্য পরিবারের বিকল্প নেই। কোরআনে সূরা নাহলের ৭২ নং আয়াতে এসেছে : 'তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের স্বজাতীয় জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন আর তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের দান করেছেন পুত্র ও পৌত্র।'

কোরআন মজীদে 'বাইত' শব্দটি পরিবার অর্থে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। কোরআনের এ আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, মানবতার ধর্ম ইসলাম পরিবার ও পারিবারিক জীবনের ওপর যথেষ্ট তাগিদ দিয়েছে। পবিত্র কোরআনে পরিবারের অপরিহার্যতার দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

এখন আমরা পবিত্র কোরআনে পরিবারের গুরুত্ব নিয়ে খানিকটা আলোচনা করব।

প্রশান্তির স্থান : পরিবার তথা গৃহের অন্যতম কাজ হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করা। পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডি ও নিরাপদ আলয়ে মানুষ তার আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে এবং তার সহজাত কামনা-বাসনা এবং দৈহিক ও আত্মিক চাহিদাগুলোর নিবৃত্তি করতে সক্ষম হয়। মহান স্রষ্টা নিজেকে এই প্রশান্তি ও নিরাপত্তার উৎস হিসেবে উল্লেখ করে বলেন :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

অর্থাৎ 'আল্লাহ করে দিয়েছেন তোমাদের গৃহকে অবস্থানের জায়গা'। (সূরা নাহল : ৮০)

আরবি 'সাকানা' শব্দটির অর্থ হচ্ছে যার মাধ্যমে মানুষ প্রশান্তি ও তৃপ্তি লাভ করে।

(১) মানুষ গৃহে তার শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজন মেটাবার পাশাপাশি আত্মিক ও মানসিক উপশমের জন্য সামাজিক বিধিনিষেধের গণ্ডি এড়িয়ে একান্তে নিজ আলয়ে বিশ্রাম এবং নিজ স্রষ্টার সাথে ভাব বিনিময় তথা প্রার্থনার প্রয়োজন অনুভব করে। পরিবার যদি তার এ চাহিদা মেটাতে না পারে তাহলে তা শান্তির নীড় হতে পারে না।

স্রষ্টার স্মরণ ও যিকিরের স্থান : সূরা আহযাবের ৩৪ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন :

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

অর্থ : আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে।

এ আয়াতটি নবী করিম (সা.)-এর স্ত্রীদের প্রতি সম্বোধন করে নাযিল করা হয়েছে। এ আয়াতে লক্ষণীয় বিষয়গুলো হচ্ছে :

প্রথমত, গৃহ বা পরিবার থেকে মানুষ যে মূল্যবোধ অর্জন করে তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং একে পুরো জীবনের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিবার হচ্ছে বিশ্বের সব পরিবারের জন্য উত্তম আদর্শ। কাজেই আল্লাহর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে তাঁদেরকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

তৃতীয়ত, গৃহের নিবিড় ও শান্ত পরিবেশ যদি স্রষ্টার আনুগত্য ও তাঁর স্মরণের স্থানে পরিণত হয় তখন স্রষ্টা নিজেই সেই গৃহের মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দেন। সূরা নূরের ৩৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

অর্থ : আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।

আল্লামা তাবাতাবায়ী তাঁর 'তাফসীরে আল মীযান' গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, যে আবাস পাক-পবিত্র ও নিষ্কলুষ সেটি স্রষ্টার ইবাদত ও স্মরণের স্থানে পরিণত হবে। তখন তা আর নিষ্প্রাণ চার দেয়ালের সাধারণ গৃহ থাকবে না; বরং ঐশী রং এ রঙিন হয়ে আধ্যাত্মিক এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করবে। এর ঐশী দিক যতটা জোরালো ও গাঢ় হবে গৃহের মর্যাদা ততই বাড়বে।

'বায়তুল্লাহ' বা কাবা ঘর হচ্ছে এর বাস্তব নিদর্শন।(১)

ঐশী বন্ধনের স্থান : সূরা নূরের ৬১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন:

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُ طَ وا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً يِّبَةً

অর্থ : অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দোয়া।

এ আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায়, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে 'সালাম' ও শুভ কামনার মাধ্যমে এবং আল্লাহর স্মরণ ও খোদাভীতি তাদের মধ্যে থাকতে হবে। পরিবারে এ ধরনের পবিত্র আবহ বিরাজ করলে নিঃসন্দেহে তা সমাজেও ছড়িয়ে পড়বে। কাজেই সালামের তাৎপর্য হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, আস্থা ও ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয়া।

গৃহের মান ও সম্ভ্রম রক্ষা : পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ পরিবারের মর্যাদার ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছেন। আর তাই এ ঐশী গ্রন্থের একাধিক আয়াতে পরিবার সুরক্ষার নানা দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সূরা নূরের ২৭ নং আয়াতে রয়েছে :

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।'

এ আয়াতে আল্লাহ পাক অনুমতি ও সালাম ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশ নিষিধ করেছেন এবং পরিবারের মান ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এ ধরনের বিধি-নিষেধ মেনে চলাকে জরুরি বলে উল্লেখ করেছেন।

'সালাম' শব্দটির মধ্যে রয়েছে পরিবারের সদস্যদের প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা এবং তাদের প্রতি আন্তরিকতা ও শান্তির ঘোষণা দেয়া।

আদী ইবনে সেবাত থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার আনসার গোত্রের এক মহিলা রাসূলে খোদা (সা.)-এর নিকট আগমন করে বলেন, 'আমি নিজ গৃহে অনেক সময় একান্তে থাকতে চাই এবং পরিবারের অপরাপর সদস্যদের কেউ–আমার পিতা, সন্তান কিংবা অন্য কোন পুরুষ আত্মীয়–যদি গৃহে প্রবেশ করেন, তখন কী করব?' মহিলার এ প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতের আলোকে বলা যায়, অপরের গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে গৃহকর্তার অনুমতি ছাড়া গৃহের ভেতরে প্রবেশ করা যাবে না।

এ ছাড়া সূরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াতে নবী করিম (সা.)-এর গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রেও অনুমতি নেবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআনের দৃষ্টিতে পরিবারের সংজ্ঞা : পবিত্র কোরআনের আলোকে 'পরিবার' হচ্ছে এমন একটি সংগঠন যার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে এর

সদস্যদের, যেমন : স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানদের আত্মিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা এবং তাদেরকে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করা।

সূরা ফোরকানের ৭৪ নং আয়াতে এসেছে :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

অর্থ : এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।

এ আয়াতে একটি আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য পরিবারের গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি একটি সুস্থ ও আদর্শ পারিবারিক আবহ যে ঈমানদারদের পরম কাঙ্ক্ষিত তা উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি আদর্শ পরিবারের ভিত্তি গৃহের সদস্যদের মধ্যকার আন্তরিক ও নিবিড় সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। পরস্পরের প্রতি দায়িত্বানুভূতি পরিবারের বন্ধনকে দৃঢ় ও অটুট রাখে। পরিবারের সদস্যরা যদি স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করে নিজেদের মধ্যকার বন্ধনকে ধরে রাখতে পারে তবে মানবীয় উৎকর্ষতা ও পূর্ণতা অর্জন সহজতর হয়।

সূরা রূমের ২১ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

অর্থ : এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আর এক নিদর্শন (হচ্ছে) : তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন; নিশ্চয় চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন আছে।

এ আয়াতের লক্ষণীয় বিষয়গুলো হচ্ছে :

প্রথমত, (مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا) 'তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন'

পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, গৃহে পরিবারের সদস্যদের প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে। প্রত্যেকের চরিত্রের ভালো ও মন্দ দিক, চারিত্রিক গুণ বা দুর্বলতা সবই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ফলে পরিবারই হচ্ছে নিজেকে গড়ার তথা সংশোধনের অন্যতম পীঠস্থান। সন্তানের প্রতি মা-বাবার স্নেহ, দয়া-মমতা এবং মা-বাবার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, আস্থা-বিশ্বাস ও ত্যাগের মাধ্যমে প্রত্যেকেই নিজেদের চারিত্রিক ত্রুটিগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের বাহ্যিক পরিশীলতার চেয়ে আত্মিক শুদ্ধতা ও পবিত্রতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর গৃহের আন্তরিক ও নিবিড় পরিবেশে ভালোবাসা ও মমতার ছোঁয়ায় মানুষের আত্মগঠন ও সংশোধনের প্রক্রিয়া সহজ হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً) 'তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন'

মহান আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা মানুষের চিরন্তন প্রকৃতিজাত করে দিয়েছেন।

এসব গুণ ও অনুভূতির মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী আত্মিক পরিশুদ্ধতার পাশাপাশি নিজ স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে অপার সুখ ও প্রশান্তি অর্জন করতে পারে।

তৃতীয়ত, (لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) 'যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও'

প্রশান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন পারিবারিক জীবনের অপর একটি লক্ষ্য। পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী এবং পরবর্তীকালে সন্তানদের দায়িত্ব হচ্ছে এ লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়া।

চতুর্থত, (وَرَحْمَةً) 'তিনি তোমাদের মধ্যে রহমত ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন'

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, মায়া, মমতা ও সহানুভূতি পরিবারে শান্তি ও নিরাপত্তার অনুভূতি ছড়িয়ে দিতে পারে। শান্তিপূর্ণ ও সুস্থ পারিবারিক আবহে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে তৈরি হয় ভালোবাসা ও হৃদ্যতা। এ ধরনের পরিবেশে প্রতিপালিত ও বেড়ে ওঠা সন্তানরাই একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজের ভিত্তি নির্মাণ করতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার হলো একটি শিশুর জীবন গড়ার প্রাথমিক পাঠশালা ও প্রধান পাঠাগার। এ পাঠশালার ওপর শিশুর জীবনের ভিত রচিত হয়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসবাসের মধ্য দিয়েই শিশুরা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রচনার গুণাগুণের পরিচয় লাভ করতে শুরু করে। এ জন্য পরিবারের প্রধান দুজন সদস্য বাবা-মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। মাতা-পিতার কারণে শিশু পৃথিবীর মুখ দেখতে পেরেছে। মমতাময়ী মায়ের কারণেই সন্তানের পৃথিবীর আলো দেখার সৌভাগ্য হয় এবং নিরাপদে বেড়ে ওঠে। সন্তান গর্ভে ধারণ, প্রসববেদনার কষ্ট

এবং দুধপান করানো প্রভৃতি মা একাই বহন করে থাকেন। এরপর বাবা লালন-পালনের কাজে মায়ের সঙ্গে অংশীদার হয়ে থাকেন। এর বাহ্যিক প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ তাআলা সন্তানের প্রতি তার মাতা-পিতার সঙ্গে সদয় ও সদ্ব্যবহারকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং ইবাদত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।

সূরা বনী ইসরাইলের ২৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন :

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

অর্থ তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন : তোমরা তাঁর ইবাদত ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত কর না, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোনো একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে 'উহ্' পর্যন্তও বল না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মান ও মর্যাদার সাথে কথা বল।

পিতা-মাতার দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানদের লালন-পালন করা, তাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা। রাসূলে খোদা (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী, সন্তান হচ্ছে পিতা-মাতার কাছে আল্লার আমানতস্বরূপ। তাই তাদেরকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি অবশ্যই নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি শিক্ষা দিতে হবে। নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'যখন তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হয় তখন তাদের নামাজের প্রশিক্ষণ দাও।' অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে : 'সুন্দর নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে উত্তম আর কিছুই পিতা-মাতা সন্তানদের দান করতে পারে না।'

বিশ্বনবী (সা.) পারিবারিক জীবনের সুস্থতার ওপরে ভীষণ গুরুত্ব প্রদান করেছেন, যা আমাদের অনুসরণযোগ্য। হাদিসে এসেছে যে, রাসূলে খোদা (সা.) একবার তাঁর মেয়ে ফাতেমা (সা. আ.), তাঁর স্বামী হযরত আলী ও হাসান-হোসাইনকে এক চাদরের নিচে রেখে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন : 'হে আল্লাহ! এরা হচ্ছে আমার আহলে বাইত (পরিবার)।'

পরিবারের সদস্যদের সাথে উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ মর্যাদায় উচ্চ স্তরে পৌঁছে। অপর একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : 'মুমিনের মধ্যে ঐ ব্যক্তির ঈমান সবচেয়ে পরিপূর্ণ, যে চরিত্রের সৌন্দর্যে উন্নত এবং নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতি সর্বাপেক্ষা সদয় ও নম্র ব্যবহার করে।'

স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা, ভাই-বোন প্রভৃতি নিয়ে গঠিত হয় পরিবার। তাই সুস্থ পরিবার গঠনে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, জীবনের অন্য সকল দিকের মতো পরিবার ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কেও ইসলামের রয়েছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। একটি পুরুষ ও নারী কিভাবে দাম্পত্য জীবন শুরু করবে, তাদের একের প্রতি অন্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও বিসম্বাদ দেখা দিলে কীভাবে তার সমাধান করবে সব বিষয়েই ইসলাম দিয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, ইসলামের সেসব নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ার আজ বিশ্বের মুসলিম সমাজ ভুগছে নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে।

জাতিসংঘ প্রতি বছর ১৫ মে 'আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস' পালন করে। তারা পরিবার বিষয়ে সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা এবং শান্তিময় জীবন লাভের স্বপ্ন নিয়ে এ দিবসের নানা আয়োজন করে।

অথচ আমাদের প্রাণের ধর্ম ইসলাম শান্তিময় জীবন ও পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য শেখানোর জন্য দিয়েছে 'পরিবার ব্যবস্থা'। কোরআনের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করলেই কেবল আদর্শ পরিবার গঠন করা সম্ভব। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর নির্দেশিত পথে আমাদের পরিবারগুলো গঠন করার তওফিক দিন।

– লেখক ও গবেষক

www.iranmirrorbd.com

ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ওয়েব সাইট

দেখুন ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ওয়েব সাইট www.iranmirrorbd.com। এতে রয়েছে বাংলায় ডাবিংকৃত ইরানি চলচ্চিত্র ও ডকুমেন্টারি, ইরানের শিল্প, সাহিত্য, সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানসহ নানা তথ্য। তাছাড়া থাকছে ফারসি ভাষা শিক্ষা, পবিত্র কুরআন, হাদিস ও ইসলামি দর্শনসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধসমূহ। কাজেই আর দেরি না করে ভিজিট করুন এই ওয়েব সাইট। ওয়েবসাইট সম্পর্কে মতামত জানাতে যোগাযোগ করুন info@iranmirrorbd.com এই ঠিকানায়।

ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নতুন ইন্সটাগ্রাম পেইজ ও ইউটিউব চ্যানেল চালু

ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নতুন ইন্সটাগ্রাম পেইজ ও ইউটিউব চ্যানেল চালু করা হয়েছে। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং দেশটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় তথ্য পেতে পেইজটি আজই ভিজিট করুন।

ইন্সটাগ্রাম পেইজের ঠিকানা https://www.instagram.com/iran_cultural_center_dhaka?r=nametag

নিয়মিত তথ্য পেতে পেইজটির ফলোয়ার হোন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।

আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের নাম: iran-culture-bd

ইউটিউব চ্যানেলের ঠিকানা:

https://www.youtube.com/channel/UCqpd3vaK56AK2yRpfR124kw

ইসলামে নারী অধিকারের স্বরূপ

শাহনাজ আরফিন*

নারী ও পুরুষকে নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণকারী দুটি গ্রহের সাথে তুলনা করা যায়। আর নারী-পুরষের সৌভাগ্য তথা মানব সমাজের পূর্ণতা ও কল্যাণ, নারী ও পুরুষের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন বা নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে নারীকে কালের পরিক্রমায় অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন ও নানা বাধা-বিঘ্ন সহ্য করতে হয়েছে। আর অধিকাংশ সমাজেই নারী হয়েছে নানা বঞ্চনা ও শোষণের শিকার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আজকের আধুনিক ও প্রগতিশীল সমাজেও নারীর অধিকার নানাভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং নারীরা বিভিন্নভাবে শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। অবশ্য এটাও ঠিক যে, মানব সমাজে বিরাজমান নানা বিষয় নারী অধিকারের ওপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এর মধ্যে সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং বিভিন্ন সমাজে বিরাজমান প্রথা-সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

আজকের আধুনিক সমাজে নারী অধিকারের বিষয়টি ব্যাপকভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। আর এ কারণে নারী-অধিকার নিয়ে নানা মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিরও জন্ম হয়েছে। এদের মধ্যে অনেক মতাদর্শ আবার অপর মতাদর্শের পরিপন্থী। নারীবিষয়ক নানা মতাদর্শের মধ্যে 'নারীবাদী' বা 'ফেমিনিস্ট আন্দোলন' অন্যতম। নারীবাদ (Feminism) প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য একটি অস্বাভাবিক, কৃত্রিম ও উদ্দেশ্যমূলক আন্দোলনের ফসল। এর লক্ষ্য হলো সকল অদৃশ্য বিশ্বাস, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করা।

এ মতাদর্শে বিশ্বাসীরা নারী অধিকারের ব্যাপারে উগ্র দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। তারা নারীকে পুরুষের গুণাবলি ও অধিকার অর্জনে উৎসাহিত করে এবং নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা অর্জনের জন্য সমাজ কাঠামোয় পরিবর্তন বা বিপ্লব সাধনে বিশ্বাসী। আর এক্ষেত্রে তারা ধর্ম, সহজাত প্রকৃতি, প্রথা ও পরিবারের ভূমিকাকে গুরুত্বহীন বলে মনে করে। আর এভাবে নারীবাদীরা নারী ও পুরুষের বিশেষ প্রকৃতি, চাহিদা ও অধিকারকে অগ্রাহ্য করে তাদের মধ্যে এক ধরনের কৃত্রিম সমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

অতীতে যেমন পুরুষতন্ত্র ও নারীবিদ্বেষ, মানব সমাজ বিশেষ করে নারী জাতির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে, তেমনিভাবে নারী অধিকার নিয়ে নারীবাদীদের চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ি নারী-পুরুষ তথা মানব সমাজের জন্যই অকল্যাণ বয়ে আনবে। ঐশী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন নারী-পুরুষের অধিকার সম্পর্কে কোন ধরনের বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় দেয় না। পবিত্র কোরআনের মতে, নারী-পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন সহজাত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মানবিকতার দিক দিয়ে উভয়েই সমান। ইসলামের আলোকে 'নারী ও পুরুষের সাম্য' কথাটি গোলাপ ও বেলীর গুণাগুণ সমান বলার মতোই একটি অযৌক্তিক কথা। কারণ, এ দুটি ফুলেরই রয়েছে পৃথক পৃথক ঘ্রাণ, বর্ণ, আকৃতি ও সৌন্দর্য।

তেমনিভাবে নারী-পুরুষও এক নয়। এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে ভিন্ন গঠন প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য। মহিলারা যেমন হতে পারে না পুরুষের সমান, তেমনি পুরুষরাও হতে পারে না মহিলাদের সমান। তাই ইসলাম এদের উভয়কে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় না করিয়ে একে অপরের সহযোগী হিসেবে মূল্যায়ন করেছে। নিজস্ব গঠনপ্রকৃতি অনুযায়ী এদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে পৃথক পৃথক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পুরুষের যেহেতু বহু গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ সম্পাদন করতে হয়; তাই তাকে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের মতো কিছু সামাজিক প্রাধান্য ও সুবিধা ভোগের সুযোগ দেয়া হয়।

প্রথমত, তাকে অর্থনৈতিক গুরু দায়িত্ব বহন করতে হয়। কেননা, পরিবারের সার্বিক ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব পুরুষের। অপরদিকে স্ত্রী যদি ধনী হন, কিংবা তিনি যদি আর্থিকভাবে স্বাধীন হয়েও থাকেন, তবুও তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব স্বামীর ওপর। আদর্শবাদী মুসলিম সমাজে নারীকে জীবিকার জন্য কোন দুঃশ্চিন্তা করতে হয় না।

দ্বিতীয়ত, একজন মুসলিম নারী,স্বামী খুঁজে পাওয়া কিংবা না-পাওয়ার ভয়াবহ দুঃশ্চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। নারীর স্বাভাবিক চারিত্রিক দাবি অনুযায়ী তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ তার জন্য কোন উপযুক্ত বর খুঁজে না আনা পর্যন্ত সে গৃহেই অবস্থান করে থাকে। এ ধরনের বিবাহই হচ্ছে প্রকৃত ধর্মসম্মত বিবাহ এবং এতেই পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন স্থায়িত্ব পায়।

তৃতীয়ত, প্রয়োজন ছাড়া মুসলিম মহিলারা রক্তাক্ত যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ থেকে মুক্ত। এটাকে অনেকের কাছে একটি বঞ্চনা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু নারী প্রকৃতির আলোকে বিচার করলে দেখা

যাবে যে, অধিকাংশ নারীর পক্ষেই এ ধরনের কাজে অংশগ্রহণ খুবই ভারী ও কঠিন বলে প্রমাণিত। এমনকি আধুনিক যে সকল সমাজে 'সাম্যবাদী' পদ্ধতিতে নারী ও পুরুষকে সমান করার প্রক্রিয়া চলছে সে সকল সমাজেও চরম কোন অবস্থা না দেখা দেয়া পর্যন্ত মহিলাদেরকে সামরিক বাহিনী বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে দূরে রাখা হচ্ছে।

ইসলাম নারী ও পুরুষের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদেরকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সমাজে তাদের কর্ম ও অবস্থান নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলাম পুরুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য প্রদান করেছে এ জন্য যে, পুরুষদেরকে পরিবারের সকল দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয়। এছাড়া তাদেরকেই পারিবারিক বিভিন্ন সংকট, আর্থিক, সামাজিক ও অন্য সকল চাপ থেকে পরিবারের সদস্যদেরকে রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়।

পবিত্র কোরআনে সূরা ইয়াসীনের ৪০ নম্বর আয়াতে এসেছে :

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

অর্থাৎ সূর্য চন্দ্রের নাগাল পায় না, রাত দিনকে অতিক্রম করে না এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করে।

নারী-পুরুষও ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের মতো এবং তাদের উচিত নিজ নিজ গতি পথে পরিভ্রমণ করা।

স্বাধীনতা এবং সাম্য তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন তারা নিজস্ব গতি ও প্রকৃতির উপর অটল থাকবে। এর অন্যথায় সামাজিক স্থিতি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হতে বাধ্য। ইসলামে নারী অধিকারের সমালোচকদের অনেকেই প্রশ্ন করেন, যদি ইসলাম ধর্মে নারীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হতো তাহলে কি এ ধর্মে নারী-পুরুষের জন্য সম অধিকার নিশ্চিত করা হতো না?

এ প্রশ্ন বা সমালোচনার জবাব দিতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, মানবিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা বলতে কি তাদের অধিকারের সাদৃশ্য বোঝায়, না কি সমতা ও সাদৃশ্য দুটি ভিন্ন বিষয়?

ইরানের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক মুর্তাজা মোতাহহারী এ সম্পর্কে লিখেছেন, সমতা ও সাদৃশ্য দুটি ভিন্ন জিনিস। সমতা বলতে সাম্য বা সমান ভাগ বোঝায়। আর সাদৃশ্য হচ্ছে অনুরূপতা। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন পিতা তার সন্তানদের মধ্যে সহায় সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে সাদৃশ্য নাও থাকতে পারে। যেমন ধরুন, পিতা কোন সন্তানকে তাঁর কৃষি জমি দিলেন, কাউকে দিলেন তাঁর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আবার কাউকে দিলেন তাঁর দোকান-পাট দেখাশোনার দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে পিতা তাঁর সন্তানদের ক্ষমতা ও যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সমভাবেই এ বণ্টনের কাজটি সমাধা করতে চেয়েছেন, কাউকে কারো ওপর প্রাধান্য দেয়া বা বৈষম্য করতে চাননি।

পবিত্র কোরআনে নারীকে কোমলতা, প্রশান্তি ও দয়ার প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে সূরা আরাফের ১৮৯ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন,

۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ

'তিনিই তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়।'

ইসলাম-পূর্ব যুগে যখন নারীরা ছিল চরম অবহেলা ও বঞ্চনার স্বীকার, কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো এবং নারীর কোন মূল্যায়নই করা হতো না, তখন ইসলাম দিয়েছে নারীর মুক্তি ও নিরাপত্তা। কন্যাসন্তানের জন্মকে বলা হলো 'সুসংবাদ'।

কোরআন মজীদের সূরা আন নাহলের (৫৮-৫৯) নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন :

তাদের কাউকে যখন কন্যাসন্তানের 'সুসংবাদ' দেয়া হয় তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। সে এ সুসংবাদকে খারাপ মনে করে নিজ সম্প্রদায় থেকে লুকিয়ে বেড়ায় (এবং চিন্তা করে) হীনতা স্বীকার করে তাকে নিজের কাছে রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। কত নিকৃষ্ট ছিল তাদের সিদ্ধান্ত।

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সূরা নিসা নামে পূর্ণাঙ্গ একটি সূরা নাযিল করেছেন কেবল নারীর যাবতীয় স্বাধীনতা ও অধিকারের বার্তা নিয়ে। পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারার ২২৮ নম্বর আয়াতে নারী অধিকারের কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন : 'নারীদের (পুরুষদের উপর) তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমনি রয়েছে নারীদের উপর পুরুষদের।'

এ আয়াতে যেমন সুস্পষ্টভাবে নারীদের অধিকারের কথা বলা হয়েছে, অন্য কোনো ধর্মে এভাবে নারীর অধিকারের কথা বলা হয়নি।

এছাড়া হাদীসে এসেছে : 'নারীকে সযত্নে লালনপালনকারী পিতামাতার অবস্থান হবে জান্নাতে।'

বিশ্বনবী (সা.) বিশ্ব মানবতার অনন্য আদর্শ হিসেবে নারীর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষায় কোন ধরনের কার্পণ্য করেননি। তিনি নিজ কন্যা ফাতেমা যাহরা (সা. আ.)-এর হাতে চুমু খেতেন, তাঁর সম্মানে নিজ জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেন।

নবীজির বিখ্যাত একটি উক্তি হচ্ছে এরকম : 'তোমাদের মধ্যে সেই পুরুষ সবচেয়ে ভালো যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো।'

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম নারীজাতীকে যে সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে অন্য কোন ধর্মে তা দেয়া হয়নি। বিশ্বের নারী সমাজ যত বেশি চিন্তা ও গবেষণা করবেন তত দ্রুত তাঁরা এ সত্যকে অনুধাবন করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

লেখক ও গবেষক

জেনারেল সোলাইমানি : অন্তহীন এক বীরের স্মৃতিকথা

সিরাজুল ইসলাম

কালের গর্ভে চলে গেল একটি বছর। স্মৃতির পাতায় জমা হয়েছে অনেক কথা, অনেক দুঃখ-ব্যথা। তিনি চলে গেছেন নশ্বর এ পৃথিবী ছেড়ে। কিন্তু স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে আছেন এখনো। এই উজ্জ্বল নক্ষত্র আর কেউ নন, তিনি ইরানের মহাবীর কাসেম সোলাইমানি– বহু বিপ্লবী মানুষের প্রাণপুরুষ।

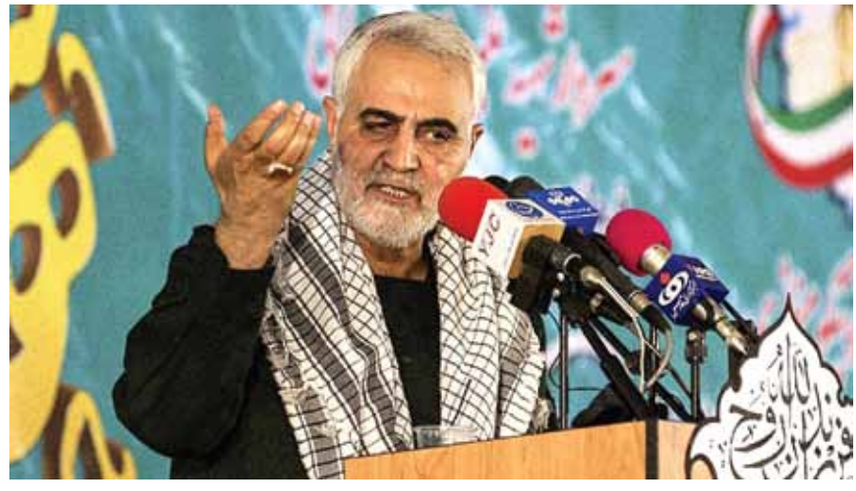

বছর ঘুরে আবার এসেছে সেই অভিশপ্ত ৩রা জানুয়ারি। ২০২০ সালের এই দিনে খুব ভোরে মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনী ইরাকের বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে ড্রোন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় জেনারেল কাসেম সোলাইমানির গাড়িবহরে। এতে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে আরো শহীদ হন ইরাকের জনপ্রিয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হাশদ আশ-শাবির সেকেন্ড ইন-কমান্ড আবু মাহদি আল-মুহান্দিস এবং আট সঙ্গী। মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিভে যায় বিশ্বের এক নম্বর সমর নায়কের প্রাণপ্রদীপ। তবে তিনি রেখে যান অজস্র কর্ম। তাঁর দেখানো পথই আলোকবর্তিকা হয়ে আছে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিরোধকামীদের জন্য। কর্মের মাঝেই বেঁচে আছেন; মহৎ কর্মের মাঝেই বেঁচে থাকবেন ইরানের এ কমান্ডার।

আমেরিকা কেন হত্যা করল জেনারেল সোলাইমানিকে?

একথা আজও বড় হয়ে দেখা দেয় যে, আমেরিকা কেন এই মহান সমরবিদকে নির্মম ও বর্বরভাবে হত্যা করল? এ আলোচনার হাত ধরে গভীরে প্রবেশ করলে বেরিয়ে আসবে আমেরিকার ভয়াবহ এক কুৎসিত চোহারা। উন্মোচিত হবে মানবতার ছদ্মাবরণে মার্কিনিদের ভয়ঙ্কর মানবতাবিরোধী তৎপরতার কথা।

কুদস ফোর্সের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল কাসেম সোলাইমানি ইরানের হয়ে সিরিয়া ও ইরাকের মাটিতে তৎপর উগ্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে জটিল ও কঠিন সব অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এসব অভিযানে সন্ত্রাসীরা সব চোখে সর্ষের ফুল দেখেছে। দিন দিন ফুরিয়ে আসছিল সন্ত্রাসীদের প্রাণবায়ু। এ অবস্থায় আমেরিকা জেনারেল সোলাইমানিকে বর্বরভাবে হত্যার পথ বেছে নেয়। কারণ, যে লক্ষ্য নিয়ে উগ্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে মধ্যপ্রাচ্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, জেনারেল সোলাইমানি বেঁচে থাকলে সেসব লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না। তাতে আমেরিকার ভাণ্ডার শূন্য থেকে যায়। শূন্যেরে তাই পূর্ণ করতেই আমেরিকা নিষ্ঠুরতার পথ বেছে নেয়; শহীদ করে জেনারেল সোলাইমানিকে।

ইসলামের শত্রুরা আইএস বা দায়েশ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে যাতে ইসলাম ও মুসলিম জাতিগুলো সম্পর্কে সারা বিশ্বে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করা যায়। অন্যদিকে তারা আইএস-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে ইরাক ও সিরিয়ায় তাদের অবৈধ উপস্থিতি জোরদার করার চেষ্টা করছে। এভাবে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ইরাক ও সিরিয়াসহ পশ্চিম এশিয়ার তেল সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর মূলোৎপাটন সম্ভব হলে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ভিন্ন হবে– একথা ভেবে আমেরিকা, ইহুদিবাদী ইসরাইল ও তাদের পশ্চিমা এবং আঞ্চলিক মিত্ররা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক সমাধান কিংবা কূটনীতির পথ কোনটাতেই তারা নিরাপদ বোধ করে নি। তারা বেছে নেয় সন্ত্রাসের পথ। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন-কানুন উপেক্ষা করে মার্কিন সরকার ও তাদের সন্ত্রাসী বাহিনী নির্জন ভোরে বাগদাদের রাজপথ রক্তে রঞ্জিত করে। শাহাদাতবরণ করেন ইরানের শীর্ষস্থানীয় সেনা কর্মকর্তা জেনারেল কাসেম সোলাইমানি। যেন শাহাদাতের সাক্ষী হয়ে বাগদাদের রাজপথে পড়ে থাকে হাতের আংটিটি।

এমন নির্মম, বেআইনি ও বর্বর হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দম্ভভরে ঘোষণা করেন যে, তাঁর সরাসরি নির্দেশে জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করা হয়েছে। যে ইহুদিবাদী ইসরাইলের জন্য মূর্তিমান আতঙ্ক ছিলেন জেনারেল সোলাইমানি, সেই ইসরাইল মোটা মাথার ট্রাম্পকে ক্ষমতায় থাকার কার্ড হিসেবে সোলাইমানি হত্যাকাণ্ডকে ব্যবহারের উসকানি দেয়। শুধু ইরান-বিরোধিতা নয় বরং ইরানের শীর্ষ সমর নায়ককে হত্যা করার মধ্য দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট টানার ঘৃণ্য কৌশল গ্রহণের প্ররোচনা দেয় তাঁর বুদ্ধিদাতারা। ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া ট্রাম্প

সহজ পথ ভেবেই তা গ্রহণ করেন এবং জেনারেল সোলাইমানিকে হত্যা করে বসেন। কিন্তু যে পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন তা যে কণ্টকাকীর্ণ তা তিনি হয়ত বুঝতে পারেন নি।

শহীদ হয়ে গেছেন জেনারেল সোলাইমানি, কিন্তু ট্রাম্পের ক্ষমতার মসনদ স্থায়ী হয় নি। অজস্র প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় বসার সুযোগ পান নি। ট্রাম্পের বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে, তিনি এই জানুয়ারিতেই বিদায় নেবেন। তাঁকে বিদায় নিতে হবে কোটি কোটি মানুষের অভিশাপ আর ঘৃণা মাথায় নিয়ে। ট্রাম্প যেসব কারণে বিশ্ববাসীর কাছে অতিমাত্রায় ঘৃণিত, নিশ্চয় জেনারেল সোলাইমানির হত্যাকাণ্ড তার প্রধান। ইরানি জেনারেলের শাহাদাতের পর বহু বীর সেনানি তৈরি হবেন তাঁর পথ ও কর্মকে এগিয়ে নিতে। কিন্তু ট্রাম্পের এই ঘৃণিত কাজ এগিয়ে নিতে আমেরিকায় কেউ আগুয়ান হবেন কিনা– সে এক মস্ত প্রশ্ন।

এর মানে হচ্ছে জেনারেল সোলাইমানি হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি আমেরিকার জন্য ভালো ফল বয়ে আনবে না, বরং ভুল ও ঘৃণিত কাজ বলেই চিহ্নিত হবে। জেনারেল সোলাইমানিকে হত্যার পর খোদ আমেরিকাতেই এর বিরোধিতা করতে দেখা গেছে। গত নির্বাচনের ডেমোক্র্যাট দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী বার্নি স্যান্ডার্স থেকে শুরু করে অনেক মার্কিন রাজনীতিকই হত্যাকাণ্ডটিকে মন্দ কাজ বলেছেন। অন্যদিকে, জেনারেল সোলাইমানির যে দাফন অনুষ্ঠান হয়েছিল তা ছিল স্মরণকালের অন্যতম বৃহত্তম জনউপস্থিতির ঘটনা।

দুঃসাহসিক অভিযানের অনন্য স্মৃতি

২০১৫ সালের ২৪ নভেম্বর। তুরস্কের সীমান্ত থেকে এক কিলোমিটার দূরে তাঁদের শেষ অভিযান। অন্য দিনগুলোর মতো সেদিনও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিমান অভিযান পরিচালনার কথা ছিল। সুখোই-২৪ বোমারু বিমান নিয়ে আকাশে উড়লেন এবং ঠিকঠাক মতো সন্ত্রাসী অবস্থানে বোমাবর্ষণ শেষে রাশিয়ার পাইলট লেফটেন্যান্ট কর্নেল ওলেগ পেশকভ এবং কো-পাইলট ক্যাপ্টেন কনস্টানটাইন মুরাখতিন সিরিয়ার হেমেইমিম ঘাঁটিতে ফিরছিলেন। কিন্তু বাধ সাধলো তুরস্কের এফ-১৬ জঙ্গিবিমান। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তুর্কি এফ-১৬ থেকে ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্র এসে আঘাত হানে সুখোই-২৪'র পেছনের অংশে। উপায়হীন হয়ে প্যারাস্যুটের সাহায্যে বিমান থেকে বেরিয়ে পড়েন দুই পাইলট।

কিন্তু ভাগ্য খারাপ; আকাশে থাকা অবস্থাতেই সিরিয়ার তুর্কমেন ১০ ব্রিগেডের সন্ত্রাসীদের গুলিতে পাইলট ওলেগ পেশকভ মারা যান। আর কোনো রকমে প্রাণে বাঁচেন কো-পাইলট মুরাখতিন। পাইলট পেশকভের দেহ মাটিতে পড়ার পর সন্ত্রাসীরা উল্লাস প্রকাশ করে এবং আক্ষেপ করতে থাকে যে, 'জীবিত পেলে পুড়িয়ে মারা যেত'! পরে লেগে যায় কো-পাইলট মুরাখতিনের খোঁজে। এরই মধ্যে রাশিয়ার এমআই-৮ হেলিকপ্টার নেমে যায় দুই পাইলটের সন্ধানে। সে অভিযানেও সন্ত্রাসীদের ছোঁড়া গোলার আঘাতে হেলিকপ্টার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং একজন উদ্ধারকারী মেরিন সেনা নিহত হন। প্রথমে খবর বের হয় যে, দুই পাইলটই নিহত হয়েছেন। পরে ফ্রান্সে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার ওরলভের মাধ্যমে খবর বের হয় যে, একজন পাইলট আহত অবস্থায় বেঁচে আছেন। এ অবস্থায় রাশিয়া সিদ্ধান্ত নেয়– যে এলাকায় বিমানটি ভূপাতিত হয়েছে সে এলাকায় উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হবে। শুরু হয় দুঃসাহসিক অভিযান; পরের ঘটনাপ্রবাহ বড়ই রোমাঞ্চকর।

ইরানের আধা সরকারি বার্তা সংস্থা 'ফার্স নিউজ' জানায় ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর আল-কুদস ফোর্সের বিশ্ববিখ্যাত কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল কাসেম সোলাইমানি ওই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং মজার বিষয় হলো কোনো রকমের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই সফলভাবে উদ্ধার অভিযান শেষ করতে সক্ষম হয়েছেন। সে গল্প জানিয়েছেন রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা স্পুৎনিকের সাংবাদিক ইমাদ আবশেনাস।

কেমন ছিল সেই অভিযান : সিরিয়ার লাতাকিয়া এলাকায় কর্মরত সিরিয় একজন সিনিয়র সেনা কর্মকর্তার কাছে ইমাদ আবশেনাস জানতে চেয়েছিলেন উদ্ধার অভিযানের কাহিনী। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিরিয়ার সেনা কর্মকর্তা জানালেন সে গল্প–

'কো-পাইলট ক্যাপ্টেন মুরাখতিন প্যারাস্যুটের সাহায্যে যে এলাকায় নামেন তা ছিল বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে। কিলোমিটারের পর কিলোমিটার এলাকা অচেনা; শুধুই শত্রুর বসবাস! সিদ্ধান্ত হলো ক্যাপ্টেন মুরাখতিনকে উদ্ধার করতে হবে। বিমানটি ভূপাতিত হওয়ার পরপরই রাশিয়ার দুটি হেলিকপ্টার রওয়ানা দিল সেদিকে। কিন্তু পশ্চিমা সমর্থিত কথিত ফ্রি সিরিয়ান আর্মি বা এফএসএ এবং তুরস্ক সমর্থিত তুর্কমেন সন্ত্রাসীরা রকেট ও উন্নত অস্ত্র দিয়ে হেলিকপ্টারগুলোর বিরুদ্ধে হামলা চালাতে থাকল। এসব অস্ত্র তারা খুব সম্প্রতি পেয়েছে। অভিযানে রাশিয়ার একজন সাহায্য কর্মী (কেউ কেউ বলছেন মেরিন সেনা) মারা গেলেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছিল– বিমান ভূপাতিত হওয়ার পর ওই

এলাকায় তুরস্ক স্পেশাল ইউনিটের সেনাদেরকে পাঠায় যাতে আটক রুশ পাইলটকে তারা নিয়ে যেতে পারে এবং পরে রাশিয়াকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারে। অন্যদিকে, রাশিয়া শিগগিরি আরেকটি অপারেশন পরিচালনার পরিকল্পনা করছিল যার মাধ্যমে নিখোঁজ পাইলটকে উদ্ধার করা যায়। এ অবস্থায় ইরানের জেনারেল সোলাইমানি রুশ সেনা কমান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তিনি একটি বিশেষ টাস্কফোর্স ইউনিট গঠনের প্রস্তাব দেন যাতে থাকবে হিজবুল্লাহর স্পেশাল ফোর্স এবং সিরিয়ার কমান্ডো সেনা যাঁদেরকে ইরান প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এসব সেনার কাছে ওই এলাকা ছিল সম্পূর্ণ পরিচিত। এদের নিয়েই জেনারেল সোলাইমানি পাইলট উদ্ধারের অভিযান পরিচালনা করবেন। আর আকাশ থেকে রুশ বাহিনী বিমান ও স্যাটেলাইট তথ্য দিয়ে সহায়তা করবে। জেনারেল সোলাইমানি রুশ সেনা কর্মকর্তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, আল্লাহ চান তো তিনি নিরাপদে এবং অক্ষত অবস্থায় পাইলটকে উদ্ধার করবেন।

রুশ পাইলটের ব্যবহার করা জিপিএস শনাক্ত করে তাঁর অবস্থান জানা গেল যে, তিনি যেখানে অবস্থান করছেন সেখান থেকে মাত্র ছয় কিলোমিটার দূরে সিরিয়ার সেনা ও সন্ত্রাসীদের ফ্রন্টলাইন। সেখানে বার বার সংঘর্ষ হয়েছে।

হিজবুল্লাহর স্পেশাল অপারেশন ইউনিটের ছয় যোদ্ধা এবং সিরিয়ার ১৮ কমান্ডোকে নিয়ে উদ্ধার অভিযানে রওয়ানা দিলেন জেনারেল সোলাইমানি। এরই মধ্যে রুশ বিমান ও হেলিকপ্টার ওই এলাকায় এমনভাবে হামলা শুরু করল যেন সন্ত্রাসীদের জন্য তা দোজখে পরিণত হলো। বিমান ও হেলিকপ্টার হামলায় সন্ত্রাসীদের সদরদপ্তর ধ্বংস হয়ে গেল এবং মোতায়েন করা শত্রুরা যারা বেঁচে আছে তারা পালিয়ে যেতে থাকল। এ পর্যায়ে শুরু হলো স্পেশাল ইউনিটের স্থল অভিযান।'

গল্পের মাঝে সিরিয়ার ওই সেনা কর্মকর্তা জানালেন, 'অভিযানের পুরো সময় স্পেশাল ইউনিট রাশিয়ার স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের আওতায় কাজ করেছে। পাইলটের অবস্থানের ১০০ মিটারের কাছাকাছি পৌঁছলে তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয় এবং সে সময় ক্রেমলিনের একজন অত্যন্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে প্রতি মুহূর্তের অভিযানের রিপোর্ট জানানো হচ্ছিল (বলা হয়েছিল রুশ উচ্চপদস্থ এ কর্মকর্তা আর কেউ নন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট পুতিন) এবং এটা পরিষ্কার যে, মস্কো থেকে তিনি পুরো অভিযান স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করছিলেন।'

গল্পের কথক সিরিয়ার ওই সেনা কর্মকর্তার বর্ণনা অনুসারে- 'অভিযানের এক পর্যায়ে তা সন্ত্রাসী ধরার অভিযানে পরিণত হয় যা আকাশ থেকে পরিচালনা করছিল রুশ বাহিনী আর স্থলভাগ থেকে জেনারেল সোলাইমানি। অভিযানের সময় রুশ বাহিনী শক্তিশালী ইলেক্ট্রনিক ওয়ারফেয়ার শুরু করে এবং শত্রুদের সব ধরনের স্যাটেলাইট ও যোগাযোগ যন্ত্র অকেজো হয়ে যায়। এ যুদ্ধ শুরু হয় অভিযানের মূল এলাকায় পৌঁছানোর কয়েক কিলোমিটার আগে থেকেই। যখন শত্রুরা বুঝতে পারল ইলেক্ট্রনিক ওয়ারফেয়ারের মতো কিছু একটা ঘটছে ততক্ষণে অপারেশন শেষ। রুশ বাহিনীর উদ্বেগ ছিল যে, পশ্চিমা স্যাটেলাইটগুলো সন্ত্রাসীদের কাছে এ অভিযানের কথা ফাঁস করে দিতে পারে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত স্পেশাল ইউনিট শত্রু লাইনের ছয় কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে পাইলটকে নিরাপদে উদ্ধার করে। এ সময় শত্রুপক্ষের উন্নত প্রযুক্তির সরঞ্জামাদি ধ্বংস করা হয় এবং এগুলো যারা পরিচালনা করছিল তারাও নিহত হয়। সবচেয়ে মজার বিষয় ছিল- যে ২৪ জনকে নিয়ে স্পেশাল ইউনিট গঠন করা হয়েছিল তাদের সবাই পাইলট মুরাখতিনকে নিয়ে নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে আসেন। বিপজ্জনক এ মিশনে ২৪ জনের কেউই সামান্য একটু আহতও হন নি।'

হত্যাকাণ্ডে যেসব ভুল করেছে আমেরিকা

জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যার মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে নিজের ভূমিকা বিতর্কিত করেছে আমেরিকা। সিরিয়া ইস্যুসহ বিভিন্ন ঘটনায় আমেরিকা দাবি করে আসছে তারা উগ্রবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। যদিও সিরিয়ায় তৎপর উগ্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দায়েশের প্রতিষ্ঠা, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র এবং অর্থ যোগানের সবকিছুর সাথেই আমেরিকার সম্পৃক্ততা ছিল তারপরও তারা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দাবি করে আসছিল। অন্যদিকে মাঠে-ময়দানে লড়াইয়ে জেনারেল কাসেম সোলাইমানি উগ্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ইরানের কোনো শত্রুদেশও বলতে পারবে না যে, জেনারেল কাসেম সোলাইমানি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন নি। এরকম একটা পেক্ষাপটে জেনারেল সোলাইমানিকে হত্যা করে আমেরিকা প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। অর্থাৎ আমেরিকার এই ভূমিকা সন্ত্রাসীদের পক্ষে গেছে এবং সেক্ষেত্রে বলাই যায় যে, আমেরিকা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নি; বরং সন্ত্রাসীদের পক্ষে লড়াই করছে। জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যার ক্ষেত্রে এটি ছিল

আমেরিকার সবচেয়ে বড় ভুল।

জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে ৩ জানুয়ারি হত্যার পর ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেয়ী এক জরুরি বৈঠকে বসেন। সামরিক কমান্ডারদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি সরাসরি নির্দেশনা দেন যে, আমেরিকা যেভাবে জেনারেল সোলাইমানি হত্যা করেছে ঠিক একইভাবে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে পাল্টা হামলা চালাতে হবে। সর্বোচ্চ নেতাসহ ইরানের প্রেসিডেন্ট, পররাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য বহু কর্মকর্তা এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধের ঘোষণা দেন। জেনারেল সোলাইমানি হত্যাকাণ্ডের পর ৮ জানুয়ারি ইরাকে অবস্থিত দুটি মার্কিন ঘাঁটিতে ব্যাপকভাবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। ওই হামলায় আইন আল আসাদ ঘাঁটি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো- ইরান যেসব ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে তার একটিও ভূপাতিত করতে পারে নি আমেরিকা বরং আমেরিকার ঘাঁটি ও সেনারা অসহায়ের মতো আর্তনাদ করেছে এবং তারা মৃত্যুর প্রমাদ গুনেছে সেদিন। আমেরিকার এত সামরিক শক্তি, এত উন্নত প্রযুক্তি রয়েছে বলে দাবি করে অথচ ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা তারা প্রতিহত করতে পারে নি। সেক্ষেত্রে ইরান এখন তাদরে জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। আমেরিকার এই ভুলের কারণে তাদের সামরিক শক্তি, কৌশল, অস্ত্রের ব্যর্থতা এবং প্রযুক্তির দুর্বলতা মারাত্মকভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সবার মনে একই প্রশ্ন ছিল বিশ্বের এক নম্বর সামরিক শক্তির দাবিদার আমেরিকা ইরানের হামলা ঠেকাতে পারে নি। তাহলে কি আমেরিকার সামরিক প্রযুক্তি ইরানের কাছে অসহায় হয়ে গেল?

জেনারেল সোলাইমানি ছিলেন ইরানের সর্বোচ্চ পর্যায়ের একজন সামরিক কর্মকর্তা। এ পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তাকে এরকম বর্বরতার আশ্রয় নিয়ে হত্যা করা আন্তর্জাতিক আইনের প্রকাশ্য লঙ্ঘন। কিন্তু আমেরিকা তাই করেছে। সেক্ষেত্রে আবারও পরিষ্কার হয়েছে– আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমেরিকা আইনের মোটেই তোয়াক্কা করে না বরং তার স্বার্থের জন্য আইন লঙ্ঘন করতে দ্বিধা করে না।

আমেরিকা হচ্ছে বিশ্বের মানবতা রক্ষার কথিত ধ্বজাধারী একটি দেশ, কথায় কথায় তারা মানবতার বুলি আওড়ায়। প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে তারা রিপোর্ট তৈরি করে। সেই আমেরিকা অত্যন্ত নির্মমভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে একজন জেনারেলকে হত্যা করেছে। এর মধ্য দিয়ে আমেরিকা যেমন মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে, তেমনি কূটনীতির পথকে কঠোরভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছে। যদিও আমেরিকার জন্য এই ধরনের হত্যাকাণ্ড নতুন কিছু নয় তবে জেনারেল সোলাইমানি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আমেরিকা মানবতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় অভিযুক্ত। বিশ্ববাসীর কাছে আরেকবার পরিষ্কার হয়েছে– আমেরিকার কাছে শিশুদের যেমন অধিকার নেই তেমনি একজন জেনারেলেরও অধিকার আমেরিকার কাছে নেই। অর্থাৎ তারা মানুষের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেই আন্তরিক নয়। জেনারেল সোলাইমানিকে হত্যার মধ্য দিয়ে আমেরিকা সুদীর্ঘকালের কর্মকাণ্ড নতুন করে চিনিয়ে দিয়েছে।

যেকোনো সমস্যার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক সমাধান সেরা বলে বিবেচিত। কিন্তু আমেরিকা এসবের ধারে কাছে না গিয়ে বরং জেনারেল সোলাইমানিকে হত্যা করে পেশী শক্তির পরিচয় দিয়েছে। তারাই একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আমেরিকার কাছে কূটনীতি নয় বরং পেশিশক্তিই বড়।

জেনারেল সোলাইমানি হত্যার কারণে ইরান আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সামরিকভাবে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পেয়েছে, তেমনি আমেরিকার সামরিক ও প্রযুক্তিগত দুর্বলতাও ইরানের কাছে পরিষ্কার হয়েছে। সেক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যে ইরান তার প্রভাব প্রতিপত্তি আরো বেশি বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে ইরানকে বাদ দিয়ে কেউ এখন কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারবে না। ইরানের সামরিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার পাশাপাশি তার কূটনৈতিক সৌন্দর্য পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের বেশকিছু দেশকে আকৃষ্ট করবে যা আমেরিকা ও তার মিত্রদের জন্য কূটনৈতিকভাবে বড় ধরনের বিপর্যয় হিসেবে দেখা হবে।

১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামি বিপ্লব সফল হওয়ার পর থেকে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে মারাত্মক রকমের শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্ক চলে আসছে। ইরানের ভেতরে নানা রকমের নাশকতার পাশাপাশি যাত্রীবাহী বিমান ভূপাতিত করার মতো চরম অমানবিক ঘটনাও আমেরিকার ঘটিয়েছে। এবারে শীর্ষ পর্যায়ের একজন সেনা কমান্ডারকে হত্যার পর মার্কিন প্রশাসন ইরানের সঙ্গে তাদের শত্রুতার মাত্রা ভিন্ন পর্যায়ে নিয়ে গেল। ইরান এতদিন মার্কিন শত্রুতা উপেক্ষা করে নিজের মতো করে পথ চলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এবার মার্কিন সামরিক ঘাঁটির ওপর সফল হামলার মাধ্যমে আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে আরো শক্ত অবস্থান গ্রহণ করতে সুযোগ পাবে। মূলত আমেরিকা জেনারেল সোলাইমানি হত্যার মাধ্যমে ইরানকে আরও বেশি শক্ত অবস্থানে চলে যাওয়ার পথ করে দিল।

ইরানের কুদস ফোর্সের কমান্ডার জেনারেল কাসেম সোলাইমানি যে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন তাতে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিরোধকারী সংগঠনগুলোর নেতা হিসেবে মূলত তিনি কাজ করছিলেন। কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করা মানেই হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিরোধকামী সংগঠনগুলোর নেতাকে হত্যা করা। ফলে আমেরিকার বিরুদ্ধে শুধু ইরানই শক্ত অবস্থান গ্রহণ করবে না বরং ইরাক, সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিনসহ মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশে প্রতিরোধকামী সংগঠন রয়েছে সেসব দেশে ইরানের অবস্থান অনেক বেশি সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ হয়ে উঠবে। ইরান তাদের নেতা হয়ে উঠবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইরানকে এই সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে জেনারেল কাসেম সোলেইমানির শাহাদাত। শাহাদাতের এই গৌরব ও মর্যাদা প্রতিরোধকামী সংগঠনগুলোর নেতারা অর্জন করতে উদগ্রীব হয়ে উঠবেন। এতে প্রতিরোধকামী সংগঠনগুলো এবং মার্কিন ও ইসরাইল-বিরোধী প্রতিরোধ প্রবল হয়ে উঠবে। স্মরণ রাখা দরকার, যে জাতি রক্ত দিতে জানে সে জাতিকে দমিয়ে রাখা যায় না। বিজয় তাদের কাছে ধরা দিতে বাধ্য। জেনারেল কাসেম সোলাইমানির শাহাদাত মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিরোধকামী সংগঠনগুলোর কাছে এই বার্তাটিই পৌঁছে দেবে। ফলে শাহাদাতবরণের মধ্য দিয়ে জেনারেল সোলাইমানি যে মশাল প্রজ্বলন করে গেলেন সে মশাল বহন করার লোকের অভাব হবে না কোনো দিন। সে মশাল প্রজ্বলিত থাকবে যুগ-যুগান্তর ধরে। এটিই হবে অন্তহীন এই বীরের মহান কীর্তি।

লেখক– সাংবাদিক ও কলামিস্ট

পরমাণুবিজ্ঞানী ফাখরিজাদে হত্যাকাণ্ড ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়

মোহাম্মদ আতিক

ইরানের বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গবেষণা ও উদ্ভাবন বিষয়ক সংস্থার চেয়ারম্যান মোহসেন ফাখরিজাদে গত ২৭ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় সন্ত্রাসীদের বর্বরোচিত হামলায় শহীদ হয়েছেন। সন্ত্রাসীরা সুপরিকল্পিতভাবে তাঁকে হত্যা করে। তেহরানের অদূরে দামাভান্দ কাউন্টির আবসার্দ শহরের একটি সড়কে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ফাখরিজাদেকে বহনকারী গাড়িতে হামলা চালায়। ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী আইআরজিসি জানিয়েছে, ইরানের শীর্ষ পরমাণুবিজ্ঞানী মোহসেন ফাখরিজাদেকে হত্যা করার কাজে সাটেলাইট নিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রনিক ওয়ারফেয়ার ব্যবহার করা হয়েছে।

ইরানের এই পরমাণুবিজ্ঞানী হত্যার পর পরই দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মাদ জাওয়াদ জারিফ বলেছেন, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে ইসরাইলের জড়িত থাকার মারাত্মক ইঙ্গিত রয়েছে। অপরদিকে আমেরিকার দুইজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা 'নিউইয়র্ক টাইমস'কে নিশ্চিত করেছেন যে, এই হত্যার পেছনে ইসরাইল জড়িত। আমেরিকার একজন বেসামরিক কর্মকর্তা একই কথা বলেছেন 'নিউইয়র্ক টাইমস'কে। একজন পদস্থ মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে 'দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্ট' জানিয়েছে, এই হত্যাকাণ্ডে ইসরাইলের হাত থাকার ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। কয়েক বছর আগে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ইরানকে পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত করতে গিয়ে তাঁর ভাষায় মোহসেন ফাখরিজাদেকে ইরানের 'পরমাণু অস্ত্র তৈরির জনক' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'নামটি মনে রাখবেন– মোহসেন ফাখরিজাদে।'

ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব আলী শামখানি বলেছেন, শত্রুরা গত ২০ বছর ধরে ইরানের এই বিজ্ঞানীকে হত্যা করার চেষ্টা করে আসছিল। এই হত্যাকাণ্ডের পর ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের এক বিবৃতিতে বলা হয়, এটা ১৯৪৮ সালে বৈশ্বিকভাবে গৃহীত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ৩, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির অনুচ্ছেদ ৬, জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ১, ১২ ও ৫১ এবং জেনেভা কনভেনশনসমূহের দ্বিতীয় অতিরিক্ত প্রোটোকলের অনুচ্ছেদ ১৩'র সাথে সাংঘর্ষিক। একইসাথে এটা আন্তর্জাতিক অপরাধমূলক তৎপরতার বিষয়ে রাষ্ট্রসমূহের যে দায়িত্ব রয়েছে তার লঙ্ঘন এবং এটা প্রকৃতপক্ষে 'আন্তর্জাতিক টার্গেট কিলিংয়ের' নিখুঁত উদাহরণ।

ইরান এই ন্যক্কারজনক কাজের জবাব দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। ইরানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বর্তমান স্ট্র্যাটেজিক কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্সের প্রধান কামাল খাররাজি বলেছেন, দেশের শীর্ষ পরমাণুবিজ্ঞানী মোহসেন ফাখরিজাদে হত্যার বিষয়ে যথেষ্ট হিসাব-নিকাশ করে জবাব দেবে তেহরান।

জাতিসংঘে ইরানের স্থায়ী প্রতিনিধি মজিদ তাখতে রাভানচি জাতিসংঘ মহাসচিব এবং নিরাপত্তা পরিষদের প্রধানের কাছে লেখা চিঠিতে ইরানি পরমাণুবিজ্ঞানীকে হত্যার নিন্দা জানানোর আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এ হত্যাকাণ্ডে ইসরাইলের জড়িত থাকার প্রমাণ রয়েছে। তিনি এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখানোর আহ্বান জানান।

বিজ্ঞানী ফাখরিজাদে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ইরানে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্তকরণ কিট তৈরির পাশাপাশি করোনাভাইরাসের টিকা তৈরির চলমান প্রকল্পে তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল। শহীদ ফাখরিজাদে করোনাভাইরাসের টিকা তৈরির প্রকল্প পরিচালনা করছিলেন। ইরানের পরমাণু গবেষণায় তিনিই

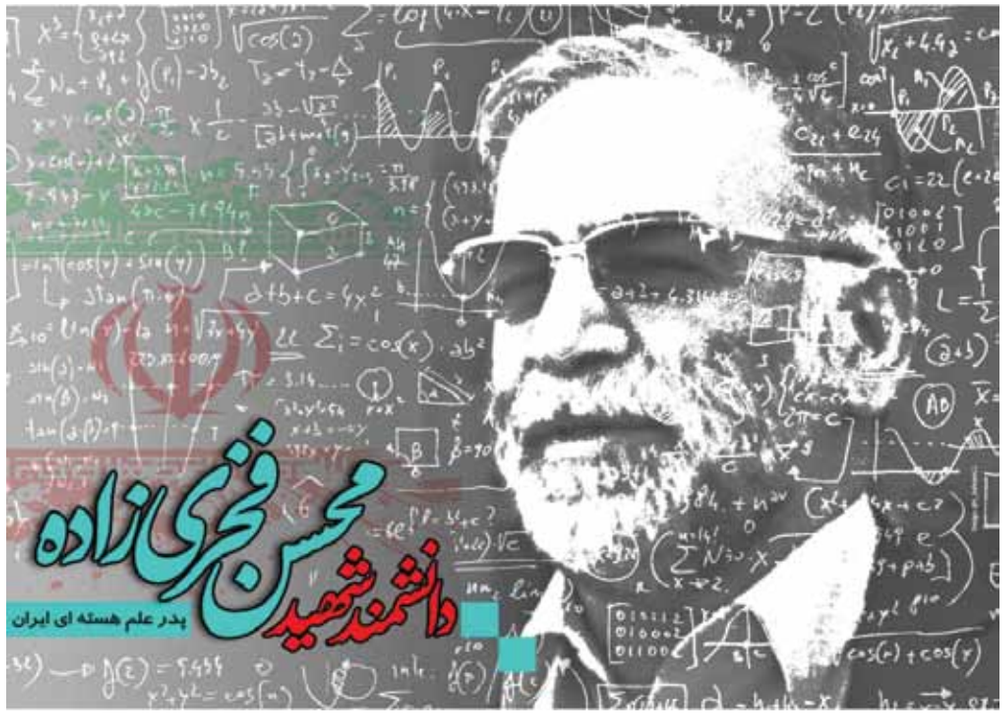

ছিলেন মুখ্য ব্যক্তিত্ব। কয়েকবছর আগে যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু চুক্তি থেকে একতরফাভাবে বেরিয়ে যাওয়ার পর ইরানের আণবিক গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। যার ফলে তাঁকে ইসরাইলের বিষ নজরে পড়তে হয়েছিল বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দার ঝড় ওঠে। রাশিয়া, তুরস্ক, কাতার, সিরিয়া, ভেনিজুয়েলা ও দক্ষিণ আফ্রিকা, ওমান, সংযুক্ত আর আমিরাত, ইরাক, আফগানিস্তান এবং কুয়েতসহ আরো বহু দেশ এবং জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা এ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানায়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান কর্মকর্তা জোসেফ বোরেল ইরানের শীর্ষস্থানীয় পরমাণু ও প্রতিরক্ষাশিল্প বিজ্ঞানী মোহসেন ফাখরিজাদের হত্যাকাণ্ডকে 'অপরাধমূলক তৎপরতা' বলে মন্তব্য করেছেন।

তিনি ব্রাসেলসে এক বক্তব্যে ইরানি বিজ্ঞানী হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানান। তবে এ হামলার পেছনে কারা জড়িত সে সম্পর্কে তিনি কোনো ইঙ্গিত করেন নি।

জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক অগাস্স ক্লামন্ড ওই সন্ত্রাসী হামলার পরপরই এক টুইট বার্তায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, এই হত্যাকাণ্ড বাইরে থেকে পরিচালিত হয়েছে এবং টার্গেট করে এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। এ পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন এবং জাতিসংঘ নীতিমালার পরিপন্থী। জাতিসংঘের এ কর্মকর্তা ইরানের বিজ্ঞানী হত্যার এ পদক্ষেপকে বেআইনি বলেও অভিহিত করেছেন।

রুশ সংসদের নিম্নকক্ষ দুমা'র পররাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান লিওনিদ স্লাতেস্কি ইরানের বিশিষ্ট পরমাণুবিজ্ঞানী মোহসেন ফাখরিজাদের হত্যাকাণ্ডকে সন্ত্রাসী হামলা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ইরানকে নতুন করে উসকানি দিতেই এ হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে। এ অবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা যাতে আর বাড়তে না পারে সে পদক্ষেপ নেয়া জরুরি।'

আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী সিনেটর এবং গত নির্বাচনের ডেমোক্র্যাট দল থেকে প্রেসিডেন্ট পদের মনোনয়ন প্রত্যাশী বার্নি স্যান্ডার্স ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের খ্যাতিমান পদার্থবিজ্ঞানী মোহসেন ফাখরিজাদে হত্যাকাণ্ডের কঠোর নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই হত্যাকাণ্ড অবৈধ এবং নতুন মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে ইরানের সমঝোতা বা আলোচনার সম্ভাবনা বানচাল করার প্রচেষ্টা।

স্যান্ডার্স তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে বলেন, মোহসেন ফাখরিজাদে হত্যার ঘটনা অবৈধ ও উসকানিমূলক। আমেরিকার নতুন একটি প্রশাসন যখন ক্ষমতা নেবে তার আগ মুহূর্তে এই হত্যাকাণ্ড একথা পরিষ্কার করে দেয় যে, ইরান ও আমেরিকার মধ্যকার সম্ভাব্য কূটনৈতিক প্রক্রিয়া বানচাল করার পদক্ষেপ এটি। তবে আমাদের এ ধরনের ঘটনা ঘটতে দেয়া মোটেই উচিত হবে না। খুন নয়, বরং কূটনৈতিক পথ হচ্ছে সামনে এগিয়ে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ পথ।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের আণবিক শক্তি সংস্থা বা এইওআই'র সাবেক প্রধান ও পরমাণুবিজ্ঞানী ফেরেইদুন আব্বাসি বলেছেন, দেশের কৌশলগত গবেষণাকর্ম বাধাগ্রস্ত করতে খ্যাতিমান বিজ্ঞানী মোহসেন ফাখরিজাদেকে শত্রুরা হত্যা করেছে। তবে শত্রুদের সমস্ত চাপ ইরান মোকাবেলা করবে।

ইরানের নিউজ চ্যানেল 'প্রেসটিভি'কে দেয়া সাক্ষাৎকারে ফেরেইদুন আব্বাসি বলেন, ১০ বছর আগে তিনি নিজেও হামলার শিকার হয়েছিলেন। এ ধরনের হামলার একটি অভিন্ন লক্ষ্য হচ্ছে ইরানের বৈজ্ঞানিক সমাজে ভীতি ছড়িয়ে দেয়া যাতে দেশের কৌশলগত গবেষণা বন্ধ হয়ে যায় এবং ইরান এসব ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে না পারে।

তিনি বলেন, "শত্রুরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তিকে হত্যা করে আমাদের সমাজে ভীতি ছড়িয়ে দিতে চায় যাতে ইরানের কর্মকর্তারা তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য হন। শত্রুরা অতীতে একই কাজ করেছে। তবে আমরা সমস্ত চাপ মোকাবেলা করে যাচ্ছি এবং আমাদের দেশ

কোনো একজন ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়।"
আব্বাসি জোর দিয়ে বলেন, সমস্ত কষ্ট-ক্লেশ সত্ত্বেও আমরা পথচলা অব্যাহত রাখব।
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের জাতীয় সম্প্রচার সংস্থা আইআরআইবি'র প্রধান আবদুল আলী আসকারি বলেছেন, বিশ্বের আধিপত্যবাদী শক্তিগুলোর জেনে রাখা উচিত, ফাখরিজাদের শাহাদাতের কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে ইরানের উন্নতি থেমে থাকবে না বরং এর ফলে উল্টো আধিপত্যকামী শক্তিগুলোর মোকাবিলায় ইরানের বিপ্লবী তরুণ বিজ্ঞানীরা তাদের দেশকে আরো এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে আরো সংকল্পবদ্ধ হবে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইরানের একাধিক পরমাণুবিজ্ঞানী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়েছেন। কিন্তু এ ধরনের অপরাধ প্রতিহত করার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় নি। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কারণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে চলতি বছরের জানুয়ারিতে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি'র কুদস ব্রিগেডের কমান্ডার জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে ড্রোন হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায়ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ট্রাম্পের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মৌখিক নিন্দা জ্ঞাপন করা ছাড়া বাস্তবে কোন পদক্ষেপ নেয় নি।
ইরানের অন্যতম শীর্ষ পরমাণুবিজ্ঞানী হত্যার ঘটনায় এক প্রতিক্রিয়ায় জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস ইসরাইলি এই অপরাধযজ্ঞের ব্যাপারে কঠোর নিন্দা ও স্পষ্ট অবস্থান নেয়ার পরিবর্তে সব পক্ষকে সংযত হওয়ার এবং যেকোন উত্তেজনা এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছেন।
ইরানি পরমাণুবিজ্ঞানী হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আসাদ আবু খালিল এক টুইট বার্তায় লিখেছেন, 'ধরুন ইরান কিংবা মার্কিন সরকারের বিরোধী কোন দেশের সরকার যদি ইসরাইলের কোন পরমাণুবিজ্ঞানীকে হত্যা করত তাহলে আমরা দেখতে পেতাম পাশ্চাত্যের সরকারগুলো ও গণমাধ্যম থেকে শুরু করে মানবাধিকার সংগঠনগুলো একযোগে এর বিরুদ্ধে কঠোর ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখাত।'
ইরানের বিচারবিভাগের মানবাধিকার বিষয়ক দফতরের প্রধান আলী বাকেরি কানি জাতিসংঘ মহাসচিব এবং এ সংস্থার মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের কাছে লেখা আলাদা চিঠিতে ওই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এ নীরবতা সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দান করবে এবং উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের বিস্তার ঘটাবে।
ইরানের বিচারবিভাগের মানবাধিকার বিষয়ক দফতরের প্রধান আলী বাকেরি কানি তাঁর ওই চিঠিতে সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে পাশ্চাত্যের দ্বিমুখী, বৈষম্যমূলক ও রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক আচরণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এর ফলে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে নীরবতা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এর ফলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হবে এবং বিশ্বের নানা প্রান্তে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটার আশঙ্কা বাড়বে।

সূত্র: প্রেসটিভি, পার্সটুডে, মেহর নিউজ, ইরনা।

'বাংলাদেশে ফারসি শিক্ষায় করোনা মহামারির প্রভাব'

(৪৩ পাতার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ খোলা ঠিক হবে কি-না। এসব বিষয় খুব ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়া অতি জরুরি। কেননা, আমাদের দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের হার এখনো কমছে না, বরং শীতের প্রকোপে তা আরো বেড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে পরীক্ষা নেয়াও জরুরি, কেননা, শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা ও রেজাল্ট শেষে তাদের পেশাগত কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। এসব অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে সময়োচিত সমাধানকল্পেই এখন আমরা সাবধানে কাজ করে যাচ্ছি।

একটি বিষয় আপনাদের সদয় অবগতির জন্য উল্লেখ করতে চাই যে, হঠাৎ করে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে আমাদের অনেক শিক্ষার্থীই আর্থিকভাবে সমস্যায় পড়ে যায়। আমরা শুরুতেই বিপদাপন্ন শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছি এবং তাদেরকে সাধ্যমতো আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছি।

অতঃপর অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছি। আমাদের দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অভাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এতে করে শিক্ষার্থীদের পরিবারের উপর আর্থিক চাপ অনেকটাই কমে যায় এবং এরকম প্রতিকূল পরিবেশেও তারা শিক্ষা কার্যক্রমে নিজেদের সংযুক্ত রাখতে সক্ষম হয়; যদিও আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সামগ্রী সরবরাহ করতে পারিনি, কেননা, আমাদেরও নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান ফারসি ভাষা ও সাহিত্য পরিবারের জন্য মাতৃপ্রতিম দেশ। একইভাবে জ্ঞানচর্চা, মেধার বিকাশ ও সংস্কৃতির লালনের ক্ষেত্রেও ইরান আমাদের সুযোগ্য অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক। আমাদের দেশে যে কোনো কারণে ফারসি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির শিক্ষা বিপদাপন্ন হলে ইরান আমাদের পাশে থাকবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। অতীতে সবসময়ই আমরা ইরানের কাছ থেকে গবেষণা ও শিক্ষা-বিষয়ক সহযোগিতা পেয়েছি, এজন্য আমরা গভীর কৃতজ্ঞ। বর্তমানে করোনা মহামারিতে আমাদের ফারসি শিক্ষার্থীরা অনেকটাই বিপদগ্রস্ত, এক্ষেত্রেও ইরানি জাতি আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াবে; এটা আমাদের বিশ্বাস। আমাদের দেশে ইরানি কালচারাল সেন্টার ও দূতাবাস রয়েছে এবং যোগ্য ও পদস্থ ব্যক্তিবর্গ সেখানে তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করে যাচ্ছেন। তাঁদের প্রতিও আমাদের দৃঢ় আস্থা রয়েছে, বিপদসঙ্কুল এ পরিস্থিতিতে মহান ইরানি জাতির পক্ষ থেকে তাঁরা বরাবরের মতোই আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীদের পাশে থাকবেন।

সমগ্র বিশ্ব করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত হোক। বিশ্বমানবতা পরিত্রাণ লাভ করুক। মর্যাদাপূর্ণ এ আন্তর্জাতিক সেমিনারে আমাকে দাওয়াত দেয়ায় সম্মানিত আয়োজকদের প্রতি জানাই অজস্র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। বাংলাদেশ ও ইরানের বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হোক। সবাইকে ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ!

‘শাবে ইয়ালদা’ ঐতিহ্যবাহী ইরানি উৎসব

সাইদুল ইসলাম

‘শাবে ইয়ালদা’ বা ইয়ালদার রাত ইরানের অন্যতম প্রাচীন ও জনপ্রিয় একটি উৎসব। ইয়ালদা শব্দের অর্থ সূচনা বা জন্ম। শাবে ইয়ালদা, ‘জন্মের রাত’। ‘সূর্যের জন্মোৎসব রাত’ বা শাবে চেল্লেহ হলো ইরানিদের শীতকালীন উৎসব যা প্রাচীন কাল থেকেই বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়ে আসছে। শীত মওসুমে নিরক্ষ রেখা থেকে সূর্যের দূরতম অবস্থানকালে উত্তর গোলার্ধের দীর্ঘতম রাতে উদ্‌যাপিত হয় শাবে ইয়ালদা। ইরানি ক্যালেন্ডার অনুসারে প্রতি বছর ডিসেম্বরের ২০ বা ২১ তারিখ রাতে উদ্‌যাপিত হয় এই উৎসব। ইরান ছাড়াও আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং কিছু ককেশীয় অঞ্চলের দেশ, যেমন- আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ায় বছরের একই সময় এই শাবে ইয়ালদা উদ্‌যাপিত হয়। এসব অঞ্চলের মানুষ যেসব কারণে শাবে ইয়ালদা উদ্‌যাপন করে থাকে তার মধ্যে শীতের আগমন এবং অন্ধকারের উপর আলোর বিজয় অন্যতম। তারা মনে করে অন্ধকার মন্দের প্রতীক। আর শাবে ইয়ালদার পরে প্রথম সকাল অন্ধকার ও অশুভ শক্তির উপর সূর্য এবং আলোর বিজয়ের সূচনা। অর্থাৎ এ রাতেই আলোর কাছে আঁধার পরাজিত হয় এবং এ রাত থেকেই মানবজাতির জন্য সুদিনের পালা বইতে শুরু করে।

বিশ্বখ্যাত ইরানি কবি জালালুদ্দিন রুমি রাতকে অবকাশকালে আগ্রাসনকারী ও নৈশকালে আকস্মিক হানাদার বাহিনী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ রাত হলো অশুভ বা মন্দের প্রতীক এবং দিন হলো ঔজ্জ্বল্য, শুভ্রতা, সচ্ছলতা, নির্মলতা ও পবিত্রতার প্রতীক। শাবে ইয়ালদা নিয়ে মহাকবি শেখ সাদি লিখেছেন,

ব্যথাতুর অন্তরে প্রশান্তির হাওয়া নাহি বয়
ইয়ালদার রজনী না পোহালে হয় না ভোরের উদয়

কবি শেখ সাদি অপর এক কবিতায় বলেছেন,

তোমার রূপ দেখা প্রতিটি সকাল যেন শুভ নববর্ষ
তোমার বিচ্ছেদের প্রতিটি রাত যেন অতি দীর্ঘ

কবি শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার বলেন,

অন্ত নেই যেমন আমার এ ব্যথাবেদনার
ইয়ালদার রজনি মোর তেমনি নয় ভোর হওয়ার।

কবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন,

প্রাণচক্ষুকে যেমন অন্ধ করে দেয় তারই সুরমায়
আলোকিত দিনকে রাত পরিণত করে ইয়ালদায়

আল বিরুনী তাঁর ‘আল-বাকিয়াহ গ্রন্থে’ ইয়ালদাকে ‘মিলাদে আকবর’ বা ‘শ্রেষ্ঠতম জন্মদিন’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যার উদ্দেশ্য সূর্যের জন্মদিন হিসেবে অধিক পরিচিত।

রাতটি যেন পরিবার ও বন্ধুদের একত্র হয়ে আনন্দময় মুহূর্ত উদ্‌যাপনের এক সোনালি রাত। সবাই মিলে ধুমধাম করে উদ্‌যাপন করা হয় বছরের এই দীর্ঘতম রাত। ‘শাবে ইয়ালদা’ ঘিরে ইরানে রয়েছে বেশ কিছু ঐতিহ্য। শীতের দীর্ঘতম এই রাতে পরিবারগুলো একত্রিত হয়ে কবিতা এবং উৎসবে মেতে ওঠে। সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী তরতাজা ফলমূলের সমাহার তো আছেই। করুণাময় এই রাতে ইরানিদের কাছে শীতকালীন শীতলতা যেন পরাস্ত হয়। ভালোবাসার উষ্ণতা পুরো পরিবারকে আলিঙ্গন করে। আত্মাগুলো একে অপরের আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে ভালোবাসা বিনিময়ে মেতে ওঠে। ২১ই ডিসেম্বরের এই রাতে বিদেশে বসবাসরত ইরানিদের জন্য রয়েছে চমৎকার কিছু সুযোগ। তাঁরা এদিন বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির

মানুষদের কাছে নিজেদের অসাধারণ এই ঐতিহ্য তুলে ধরতে পারেন। প্রথা ও রীতিনীতি ভাগাভাগি করার মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ পান। যা আন্তঃসংযুক্তির এই বিশ্বে পারস্পরিক উত্তম বোঝাপড়ার পথ প্রশস্ত করে।

ইরানের ব্যস্ততম রাস্তায় উঁকি দিলে দেখা যায় মুদি ও কনফেকশনারি দোকানগুলো যেন মহাউৎসবে মেতে উঠেছে। সব শ্রেণি-পেশার মানুষ প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার কিনে আনন্দ উপভোগের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ইয়ালদা রাতে সাধারণত পুষ্পশোভিত বাটিতে করে তরতাজা ফলমূল ও রঙিন আজিল (শুকনো ফল, বীজ ও বাদামের সংমিশ্রণ) পরিবেশন করা হয়। ইরানিদের কাছে গ্রীষ্মকালে ফলমূল হলো প্রাচুর্যের স্মারক। এই রাতের ঐতিহ্যবাহী টাটকা ফল হচ্ছে তরমুজ এবং ডালিম। এ দু'টি ফলকে অনুগ্রহের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বাস করা হয়, শীতের আগমনের আগে তরমুজ খেলে অসুস্থতার বিরুদ্ধে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

রাতে উষ্ণ খাবার শেষে অনেকে কবিতা, গল্প ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে অসাধারণ মুহূর্ত কাটান। মধ্যরাত পর্যন্ত চলতে থাকে এই উৎসব।

লোকজন নিজেদের ভাগ্যগণনাও এই রাতেই করে থাকেন। মহাকবি হাফিজ শিরাজির কাব্য সংকলনের প্রতিটি গজলের রয়েছে আলাদা আলাদা তাৎপর্য। তাঁর কাব্য সংকলনটি সামনে রেখে পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তি শুরু করেন ভাগ্যগণনা। যার ভাগ্যগণনা করা হবে তিনি পবিত্র হয়ে চোখ বন্ধ করে ৩ বার সূরা এখলাস পড়ে মনে মনে কিছু একটা চাইবেন। অতঃপর বয়স্ক ব্যক্তি কাব্য সংকলনটি তাঁর সামনে খুলে ধরে বলবেন, 'ডান পৃষ্ঠা নাকি বাম পৃষ্ঠা?' চোখ বন্ধ রেখেই লোকটি কোনো এক পৃষ্ঠায় নিজের ডান হাতটি রাখবেন এবং বয়স্ক ব্যক্তি ওই পৃষ্ঠার কবিতা ও তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবেন। এভাবেই দীর্ঘ এই রাতটি গল্পগুজবে পার করে দেন ইরানের জনগণ। তবে ইরানের কোন কোন অংশে মহাকবি ফেরদৌসীর 'শাহনামা' থেকে সুরে সুরে আবৃত্তি করা হয়। কোথাও কোথাও সারা রাত কবিতার লড়াই অনুষ্ঠিত হয়।

শাবে ইয়ালদার ভোজ 'শাবে চেল্লেহ' নামেও পরিচিত। আক্ষরিক ভাবে যার অর্থ চল্লিশের রাত। অর্থাৎ 'শাবে চেল্লেহ' বলতে শীতকালের প্রথম চল্লিশ দিনকে বোঝায়। শীতের এই দিনগুলো সাধারণত সবচেয়ে শীতল ও কঠিন হয়ে থাকে।

প্রাচীন ইরানি ক্যালেন্ডারে শীতকাল দুভাগে বিভক্ত। 'চেল্লেহ বোজোর্গ' ২২ ডিসেম্বর থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত। যার আক্ষরিক অর্থ বড় চল্লিশ। আর 'চেল্লেহ কুচাক' ৩০ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ১০ মার্চ পর্যন্ত। যার অর্থ ছোট চল্লিশ।

ইয়ালদার রাতে মূলত শীতের সূচনা উদ্‌যাপন করা হয়। একইসাথে দিন বাড়তে থাকায় সূর্যের আধিপত্য বিস্তার হতে থাকে। ইয়ালদা সরকারি কোনো ছুটির দিন না হলেও এখনও প্রাচীন কিছু ঐতিহ্যকে ছাপিয়ে যায় উৎসবটি।

সুবর্ণজয়ন্তীর দ্বারপ্রান্তে আমরা : এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

সিরাজুল ইসলাম

আর ক'দিন পরেই বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার ৫০ বছরে পা রাখবে। আমরা এমন একটি ধাপে পৌঁছাব যার নাম 'সুবর্ণজয়ন্তী'। বড় কাঙ্ক্ষিত সময় বটে। স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকী! এ এক ইতিহাস, একটি মাইল ফলক। সুবর্ণজয়ন্তীতে জেগে উঠবে পুরো দেশ। উদ্‌যাপিত হবে নানা কর্মসূচি। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন বছরব্যাপী নানা আয়োজনে উদ্‌যাপন করবে আমাদের এ সুবর্ণজয়ন্তী।

৫০ বছর মানে বেশ একটা লম্বা সময়। আমরা যখন সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করব তার মানে হবে বাংলাদেশ পেছনে ফেলে এসেছে ৫০টি বছর। অর্থাৎ তখন আমরা স্বাধীনতার ৫০ বছরে। স্বাধীনতার এই ৫০ বছরে পদার্পণ করার মধ্য দিয়ে আমরা একটি বিশেষ মাইল ফলক পার করব। স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আরো পরিপক্ব হয়ে উঠবে। আমরা জাতি হিসেবে নিজেদেরকে আরো গুছিয়ে নেব। আমাদের হিসাবের খাতায় কত যোগ-বিয়োগ হবে। কত কাটাকাটি হবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের হাত ধরে আমরা এই যে দীর্ঘ সময় পার করে এলাম, এ সময়ে আমরা কী পেয়েছি আর কী পাই নি, সঙ্গত কারণেই সে হিসাবও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করেন স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় অর্জন কী? নির্দ্বিধায়, নিঃশঙ্কচিত্তে আমি বলব স্বাধীনতা প্রাপ্তিই আমার সবচেয়ে বড় অর্জন। এই অর্জনের মধ্য দিয়ে আজ আমি ও আমরা স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে বেড়ে উঠেছি, আমরা স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি, পেয়েছি লাল-সুবজের প্রিয় পতাকা। এর চেয়ে আর কী চাই? তবু প্রাপ্তির হিসাব আসবেই। বেশ, তবে আসুন স্বাধীনতার প্রাপ্তির খাতগুলোতে নজর বুলাই।

যে পাকিস্তানের বৈষম্যের অসহায় শিকার হয়ে আমরা স্বাধীনতার পথ বেছে নিয়েছিলাম সেই পাকিস্তান এখন প্রায় সমস্ত উন্নয়ন সূচকে

আমাদের পেছনে। বাংলাদেশের গড় আয়ু (৭৩.৪) ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক খাতে দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশটির অর্জন রীতিমত ঈর্ষণীয়। শুধু কী তাই? দেখুন না, আমাদের বিজ্ঞানী মেয়ে তনিমা তাসনিম অনন্যা এখন বিশ্বের সেরা ১০ বিজ্ঞানীর একজন। এটা কী কম পাওয়া? স্বাধীনতা না এলে এই অর্জনে কী আমরা এতটা বুক ফুলিয়ে বলতে পারতাম– তনিমা আমাদের গর্বের ধন? তনিমার কথা যখন চলেই এলো তাহলে একটু সামান্য বিস্তারিত জানা যাক তার সম্পর্কে।

কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে গবেষণা করছেন তিনি। কৃষ্ণগহ্বরগুলো কীভাবে বেড়ে ওঠে এবং পরিবেশে কী প্রভাব রাখে তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র এঁকে দেখিয়েছেন তিনি। ইতোমধ্যে এ কাজের জন্য বিশ্বের সেরা ১০ বিজ্ঞানীর তালিকায় তাঁর নাম উঠেছে। তিনি একজন বাংলাদেশি তরুণী।

২৯ বছর বয়সী এই তরুণী আমেরিকার ডার্টমাউথ কলেজের সঙ্গে যুক্ত। ওয়াশিংটনভিত্তিক সায়েন্স নিউজ নামের একটি গণমাধ্যম সম্প্রতি তনিমা তাসনিমের এ সফলতার কথা জানায়। গত ৩০ সেপ্টেম্বর 'এসএন টেন : সায়েন্টিস্ট টু ওয়াচ' নামের একটি তালিকা প্রকাশ করে গণমাধ্যমটি। যেখানে তাসনিমের কাজকে 'অসাধারণ গবেষণা' বলে উল্লেখ করা হয়।

এ তো গেল একজন তনিমার কথা। এবার জানা যাক আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা। দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য আমাদের সামনে রয়েছে এলএনজি টার্মিনাল, স্পেশাল ইকোনমিক জোন, মাতারবাড়ি এনার্জি হাব, গভীর সমুদ্রবন্দরের মতো মেগা প্রকল্পের পাশাপাশি ঢাকা-চট্টগ্রাম ইকোনমিক করিডোরের জন্য হাইস্পিড রেল, ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের জন্য চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইন, উপকূলীয় মহাসড়ক নির্মাণ, আইসিটি সেক্টরে উচ্চতর পড়াশোনার সুযোগ সৃষ্টির পরিকল্পনা। কক্সবাজার-চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটন হাব গড়ে তোলার মাধ্যমে অন্যরকম এক বাংলাদেশ উপহার দিতেও কাজ করছে সরকার। এরই মধ্যে অনেক স্বপ্নের পদ্মাসেতু দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। ঢাকার বুকে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে মেট্রোরেল।

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ : স্বল্পোন্নত বা এলডিসি থেকে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি সংক্রান্ত কমিটি (সিডিপি) এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক এ তিনটি সূচকের যে কোন দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদণ্ডেই উন্নীত হয়েছে।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) মানদণ্ড অনুযায়ী এক্ষেত্রে একটি দেশের মাথাপিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে ১২৩০ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এখন ২০৬৪ মার্কিন ডলার। অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি। মানবসম্পদ সূচকে ৬৬ প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ অর্জন করেছে ৭২ দমমিক ৯। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক হতে হবে ৩২ ভাগ বা এর কম যেখানে বাংলাদেশের রয়েছে ২৪ দশমিক ৮ ভাগ।

'যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ– যেখানে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেয়ার ইতিহাস'। সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের এটি একটি বড় অর্জন।

বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় যোগ হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের সফলতাও। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাক শিল্প, ওষুধ শিল্প, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচক। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পগুলো।

দারিদ্র দূরীকরণ : ক্ষুদ্র আয়তনের একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারা বিশ্বের কাছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিবিড় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহার এবং দারিদ্র দূরীকরণে তার ভূমিকা, বৃক্ষরোপণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে জন্ম নেয়া এই বাংলাদেশকে আজকের অবস্থানে আসতে অতিক্রম করতে হয়েছে হাজারো প্রতিবন্ধকতা। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৮টি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা, শিশুমৃত্যুহার কমানো এবং দারিদ্র হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। নোবেল বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের করা মন্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। তাঁর মতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বকে চমকে দেয়ার মতো সাফল্য আছে বাংলাদেশের। বিশেষত শিক্ষা সুবিধা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার ও জন্মহার কমানো, গরিব মানুষের জন্য শৌচাগার ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান এবং শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম অন্যতম।

শিক্ষাখাতে অর্জন : শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলোর অন্যতম হলো শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম। নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি ব্যবস্থা। বর্তমান ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নতুন করে জাতীয়করণ করেছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর শতকরা হার ছিল ৬১, বর্তমানে তা উন্নীত হয়েছে শতকরা ৯৭.৭ ভাগে। শিক্ষার সুবিধাবঞ্চিত গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন প্রণয়ন করা হয়েছে; গঠন করা হয়েছে 'শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট'।

স্বাস্থ্যসেবায় সাফল্য : শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম আদর্শ দেশ হিসেবে তার স্থান করে নিয়েছে। স্বাস্থ্যখাতকে যুগোপযোগী করতে প্রণয়ন করা হয়েছে 'জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা-২০১১'। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গড়ে তোলা হয়েছে ১২ হাজার ৭৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক। ৩১২টি উপজেলা হাসপাতালকে উন্নীত করা হয়েছে ৫০ শয্যায়। মেডিক্যাল কলেজ ও জেলা হাসপাতালগুলোতে ২ হাজার শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার এবং জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। ১৯৯০ সালে নবজাতক মৃত্যুর হার ১৪৯ থেকে নেমে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৫৩-তে।

স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন ১২টি মেডিক্যাল কলেজ, নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৪৭ হাজারেও বেশি জনশক্তি।

নারী ও শিশু উন্নয়ন : নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১'। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি কার্যক্রম। সমাজের প্রতিটি স্তরে নারী অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে নেয়া হয়েছে নানামুখী পদক্ষেপ। প্রযুক্তি জগতে নারীদের প্রবেশকে সহজ করতে ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রের মতো ইউনিয়নভিত্তিক তথ্যসেবায় উদ্যোক্তা হিসেবে একজন পুরুষের পাশাপাশি নিয়োগ দেয়া হয়েছে একজন নারী উদ্যোক্তাকেও। 'জাতীয় শিশু নীতি-২০১১' প্রণয়নের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে শিশুদের সার্বিক অধিকারকে। দেশের ৪০টি জেলার সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপন করা হয়েছে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল। দুঃস্থ, এতিম, অসহায় পথ-শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য স্থাপন করা হয়েছে ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের নারী ও শিশুর উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভূষিত করা হয়েছে জাতিসংঘের 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ডে'।

নারীর ক্ষমতায়ন : নারী বঞ্চনার তিক্ত অতীত পেরিয়েছে বাংলাদেশ। নারীর ক্ষমতায়নে দেশ এখন অনেক দূর এগিয়েছে। পোশাকশিল্পে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ দেশ। আর এই শিল্পের সিংহভাগ কর্মী হচ্ছে নারী। ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশে গ্রামীণ উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে। আর ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ৮০% এর ওপর নারী। শুধু কী তাই? এনজিওগুলো যে ঋণ বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে তার অগ্রভাগে রয়েছেন নারী কর্মী; ঋণ বিতরণকারীদের বড় অংশই নারী। মোট কথা বাংলাদেশ সরকার নানাভাবে নারী উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে এসেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন : ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সব পদক্ষেপ। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌঁছে দেয়ার অভিপ্রায়ে দেশের ৪,৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত এ পোর্টালের সংখ্যা প্রায় ২৫,০০০। দেশের সবক'টি উপজেলাকে আনা হয়েছে ইন্টারনেটের আওতায়। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ১২ কোটি ৩৭ লাখ এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ৪ কোটি ৪৬ লাখে উন্নীত হয়েছে। সেবাপ্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে চালু করা হয়েছে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়েছে। ৪-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রম চলছে; দেশ এখন ৫-জি'র নেটওয়ার্ক গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। যদিও ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের সব প্রক্রিয়া এখনো শেষ হয় নি তবে দেশ সে পথে এগিয়ে যাচ্ছে বেশ ভালোভাবেই।

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা : কৃষিখাতে অভূতপূর্ব কিছু সাফল্যের জন্য বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ বারবার আলোচিত হয়েছে। প্রায় ১৮ কোটি জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৫০ লাখ মেট্রিক টন। প্রধানমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম আবিষ্কার করেছেন পাটের জিনোম সিকুয়েন্সিং। সারা বিশ্বে আজ পর্যন্ত মাত্র ১৭টি উদ্ভিদের জিনোম সিকুয়েন্সিং হয়েছে, তার মধ্যে ড. মাকসুদ করেছেন ৩টা। তাঁর এই অনন্য অর্জন বাংলাদেশের মানুষকে করেছে গর্বিত।

জনশক্তি রপ্তানি খাতে উন্নয়নে অর্জন : বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ৮৬ লাখেরও অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে। বিদেশে শ্রমিক প্রেরণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ স্থাপন করেছে অনন্য দৃষ্টান্ত। স্বল্প সুদে অভিবাসন ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করে দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে এর শাখা স্থাপন করা হয়েছে। এই ব্যাংকের মাধ্যমে এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অভিবাসন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সারাদেশে তৃণমূল পর্যায় থেকে বিদেশ গমনেচ্ছু জনগণকে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকেও

এ সেবা গ্রহণের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের হয়রানি উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে।

জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ : ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যোগদানের পর থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বের ৩৯টি দেশের ৬৪টি শান্তি মিশনে খ্যাতি ও সফলতার সাথে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এ যাবৎকালে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ১১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বাগ্রে। এ অর্জন বাংলাদেশকে বিরাটভাবে সম্মানিত করেছে।

বিদ্যুৎখাতে সাফল্য : বিদ্যুৎখাতে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে জাতীয় গ্রিডে অতিরিক্ত ৬ হাজার ৩২৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংযোজন যার ফলে বিদ্যুতের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৭ শতাংশ থেকে ৬২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই সাথে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২২০ কিলোওয়াট ঘণ্টা থেকে বেড়ে ৩৪৮ কিলোওয়াট ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছে। নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে ৩৫ লাখ গ্রাহককে। নির্মাণ করা হয়েছে নতুন ৬৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে যদিও এখনো পুরোপুরি সম্ভব হয় নি তবে দেশ এ খাতে অনেক এগিয়েছে। সাফল্যের এই ধারা অব্যাহত থাকলে শিগগিরিই দেশ বিদ্যুতের অভাবমুক্ত হবে।

শিল্প ও বাণিজ্য খাতে অর্জন : বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের পাশাপাশি প্রসার ঘটেছে আবাসন, জাহাজ, ওষুধ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য শিল্পের। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় যোগ হয়েছে জাহাজ, ওষুধ এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রী। বাংলাদেশের আইটি শিল্প বহির্বিশ্বে বেশ সুনাম কুড়িয়েছে। বাংলাদেশের আইটি শিল্প এখন বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অর্জন : হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি তৈরি করা হয়েছে। এজন্য বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃকালীন ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সময়ের ব্যবধানে এসব ভাতার হার ও আওতা ব্যাপকভাবে বাড়ানো হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ সালে এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৩ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এটি বাজেটের ১৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ। আগের অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৮১ হাজার ৮৬৫ কোটি টাকা। খানা আয়-ব্যয় জরিপের সমীক্ষায় দেখা যায় মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ ভাগের কাছাকাছি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতাভুক্ত হয়েছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনায় অর্জন : ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করতে ৫৫টি জেলায় বিদ্যমান মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশনের কাজ সম্পন্ন করার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে মোট ২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত হয়েছে 'কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১২ এর খসড়া'। এখন ইচ্ছা করলেই আর ভূমির যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারবে না।

মন্দা মোকাবেলায় সাফল্য : মন্দার প্রকোপে বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন বিপর্যস্ত ছিল বাংলাদেশ তখন বিভিন্ন উপযুক্ত প্রণোদনা প্যাকেজ ও নীতি সহায়তার মাধ্যমে মন্দা মোকাবেলায় শুধু সক্ষমই হয় নি; বরং জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ৬ শতাংশের বেশি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথ ধারার বিপরীতে আমদানি-রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে রেমিট্যান্সের পরিমাণ। ঋণ পরিশোধে সক্ষমতার মানদণ্ডে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের সমকক্ষতা অর্জিত হয়েছে। প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের মহামারিতে বিশ্ব যখন দারুনভাবে বিপর্যস্ত তখনো আমাদের গার্মেন্টস খাত লাভজনক অবস্থানে রয়েছে। করোনা মহামারির মধ্যেও বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। এ বছরই বাংলাদেশ বিশ্বে মৎস্য উৎপাদনে দ্বিতীয় অবস্থানে উন্নীত হয়েছে।

শেষ কথা : স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ ধীরে ধীরে যেসব সাফল্য অর্জন করেছে তার পেছনে সরকারের যেমন অবদান রয়েছে তেমনি অবদান আছে সাধারণ মানুষেরও। দেশের উন্নতির বিরাট অংশেই রয়েছে বেসরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ। সেক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ যদি আরো বেশি কার্যকর করা যায় তবে দেশের উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত মাত্রা স্পর্শ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নানা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, অনিয়ম ও সম্পদের অপব্যবহার রোধ করা গেলে উন্নয়নের গতি যেমন বাড়বে তেমনি টেকসই উন্নয়নও নিশ্চিত হবে। সুশাসন ও গণতন্ত্রায়নে যেসব সংকট আছে সেগুলো দূর করারও উদ্যোগ অনেক বেশি জরুরি। এতে দেশ ও দেশের মানুষ লাভবান হবে; তাতে সরকারের নেয়া নানা প্রকল্প ও রূপকল্প বাস্তবায়নের পথ সুগম হবে আর আমরা বিশ্ব দরবারে আরো শক্তভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।

মহাকবি হাফিজের কাব্যে পবিত্র কুরআনের প্রতিফলন

ড. মোঃ মুহসীন উদ্দীন মিয়া

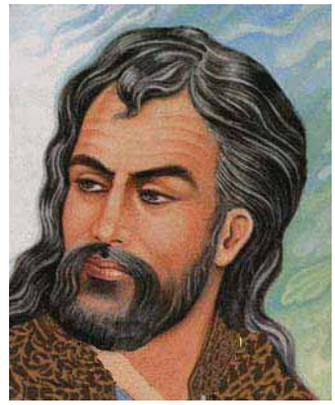

পবিত্র কুরআন সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহর বাণী। এর ভাষা ও বক্তব্য শাশ্বত, চিরন্তন। এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াতি জীবনের সবচাইতে বড় মুজিযা। ইসলাম তথা আসমানি জীবন ব্যবস্থার প্রজ্ঞাময় অবিকৃত সর্বশেষ গ্রন্থও এটি। এর সাহিত্যশৈলি ও মুজিযার কথা সর্বজনবিদিত।

কুরআনে বর্ণনার বিভিন্ন ঢং, হেকমত, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারাসহ অতি উঁচু মানের সাহিত্যালংকারের সমাবেশ ঘটেছে। এর অভ্রভেদী বাণী অনিন্দ্যসুন্দর ও বাঙ্ময় বর্ণনাশৈলীর কাছে মাথানত করেছেন বড় বড় কবি ও সাহিত্যিক। 'আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে?' [২/১৩৮, অনুবাদ মারেফুল কুরআন] আল কুরআনের এই অমোঘ বাণীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে মহান আল্লাহর রহমত ও বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে মুসলিম বিশ্বের অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক তাঁদের সাহিত্যকর্মে কুরআনশৈলী গ্রহণ করেছেন।

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অসংখ্য কবি-সাহিত্যিকও কুরআনের অলংকরণ অনুসরণ করে তাঁদের সাহিত্যকর্ম সাজিয়েছেন। এ ভাষার যে সকল সাহিত্যিক পবিত্র কুরআনকে মন ও মননে ধারণ করে নিজ অভিব্যক্তি বর্ণনায় এর শৈলীবিদ্যার সংযোগ ও সংমিশ্রণে সফল হয়েছেন তাঁদের পুরোধা পুরুষ হিসেবে হাফিজের নাম সবিশেষে উল্লেখযোগ্য।

পরিচিতি : তাঁর প্রকৃত নাম খাজা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ বিন বাহাউদ্দিন সুলগারি মোহাম্মাদ হাফিজ শিরাজী। জন্মের সময় তাঁর চেহারা সূর্যের ন্যায় উদ্ভাসিত ছিল বলে বাবা-মা তাঁর নাম রাখেন শামসুদ্দিন বা দ্বীনের সূর্য। শিরাজ নগরে জন্ম নেন বিধায় শিরাজী। শৈশবে পবিত্র কুরআন হেফ্য বা মুখস্ত করেছিলেন বলে তিনি হাফিজ নামে সর্বাধিক পরিচিতি পান।

তাঁর জন্মসাল জানা যায় নি। তবে গবেষকগণের ধারণা মতে তিনি অষ্টম হিজরি মোতাবেক খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে (১৩১০ থেকে ১৩৩০ সালের ভিতর) ইরানের শিরাজ নগরীর রুকনাবাদের মোসাল্লা নামক স্থানের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট গবেষক এ. জে. আর বারীসহ অনেক গবেষক তাঁর জন্মসাল ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। [শাহনেওয়াজ, ইনকিলাব, ২৬ জুন ২০২০]

হাফিজের মৃত্যুসন নিয়েও মতভেদ বিদ্যমান। 'শারহে গাযালহায়ে হাফেজ' প্রণেতা হোসাইন আলি হারুভি তাঁর মৃত্যুসাল ৭৯২ হিজরি মোতাবেক ১৩৯০ সাল এবং বয়স ৭২ বছর ছিল বলে উল্লেখ করেছেন [হারুভি : ১৩৯২ : ১৮] দৌলত শাহের মতে তিনি ৭৯৪ হিজরি মোতাবেক ১৩৯১ সাল এবং হাফিজের বন্ধু ও তাঁর কবিতার সর্বপ্রথম সংগ্রাহক 'গুল আন্দাম' বলেন, তাঁর মৃত্যুসাল ছিল ৭৯১ হিজরি মোতাবেক ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দ।

আবার গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের (রাজত্বকাল ১৩৮৯-১৪০৯ খ্রি.) সাথে হাফিজের পত্র বিনিময় হয়েছিল। এর থেকে অনুমিত হয় হাফিজ অন্তত ১৩৯০ সাল পর্যন্ত বেচেছিলেন। তাই দৌলত শাহের মতামতই তাঁর মৃত্যুসালের যথার্থ কাছাকাছি মতামত বলে বলে বিবেচিত হয়। [বরকত উল্লাহ : ২০১০ : ২৩৬]

পিতা বাহাউদ্দিন সুলগারির কাছেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। বাবার মুখে পবিত্র কুরআনের বাণী শুনেই তিনি কুরআনের প্রতি অনুরক্ত হন। কিন্তু পিতৃবিয়োগ ঘটলে এ সময়ে তাঁর জীবনের ছন্দপতন ঘটে। সংসারের সকল দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়লেও বিদ্যার্জনে তা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। 'মেইযানে' গ্রন্থ প্রণেতা আবদুন্নবির বর্ণনা মতে তখন তিনি একটি রুটির দোকানে কাজ নেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিকটস্থ বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন কাওয়ামুদ্দিন আবদুল্লাহর (মৃত্যু ৭৭২ হি.) কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সাথে সাথে পবিত্র কুরআন মুখস্ত করতে শুরু করেন। তাঁর কাছে থেকেই হাফিজ ইলমে কালাম, ইলমে তাফসির, ইলমে কিরআত ও দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

এছাড়াও তিনি যুগের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ শামসুদ্দিন আবদুল্লাহ শিরাজী, কাজী এযদুদ্দিন আবদুর রহমানসহ নাম না-জানা আরো অনেকের কাছে তাফসির, হাদিস, কালামশাস্ত্র, আরবি ও ফারসি সাহিত্য এবং ধর্মতত্ত্বে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জনে সমর্থ হন। (তারিক, ২০১৮ পৃ.) পবিত্র কুরআন বিশ্লেষণ বিদ্যায় তিনি তখন এতটাই পারদর্শী হয়ে ওঠেন যে, আল্লামা জামখসারি প্রণীত 'তাফসিরে কাশশাফ' গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাশিয়া গ্রন্থও লিখেছিলেন। একই সাথে ইলমে কিরআত তথা পবিত্র কুরআনের পঠন রীতির ভিন্ন ভিন্ন চৌদ্দটি পদ্ধতি করায়ত্ব করতে সমর্থ হন। (হুমায়ী : ১৩৭৩ : ১১৩)

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

عشقت رسد به فریاد ارخود به سان حافظ
قران زبر بخوانی درچها رده روایت

(গজল ৯৪ গানজুর)
তোমার প্রেম চিৎকার দিয়ে উঠবে যদি হাফিযের মতো
কুরআন মুখস্ত পড় চৌদ্দ প্রকার রেওয়ায়েত সহকারে।
(সেহাত, অক্টোবর-নভেম্বর : ২০১৮)

তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও অসামান্য কৃতিত্বের কারণে স্বদেশবাসীরা তাঁকে অসংখ্য উপাধিতে বিভূষিত করেন। যেমন : 'লিসানুল গায়েব' বা অজ্ঞাতের বাণী এবং 'তরজুমানুল আসরার' বা রহস্যের মর্মসন্ধানী ছিল তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধি। এছাড়াও 'মুলুকুল ফুজালা', 'কাশেফুল হাকায়েক', 'মাযদুবে সালেক', 'বুলবুলে শিরাজ', 'খাজা হাফিজ',

'ফাখরুল মুতাকাল্লেমিন' তাঁর উল্লেখযোগ্য উপাধি ছিল।

সাহিত্য সাধনা : হাফিজ যৌবনে প্রায় ২১ বছর বয়সেই কাব্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। মরমি ধারার সাহিত্য রচনায় তখন তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। অতি অল্প সময়ে তাঁর দর্শন ও কাব্যখ্যাতি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বহিঃবিশ্বেও ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে মুযাফফারীয় রাজবংশের আবু ইসহাক ইনযু, আমির মুবারেযুদ্দিন মুহাম্মদ এবং তাঁর পুত্র শাহশুজা ও শাহ মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তাঁর সাহিত্যকর্মে গতির সঞ্চার হয়। হাফিজ তাঁর কোন কোন গজলে এই বাদশাদের প্রশংসা করেছেন।

'দিভান' বা কাব্য সমগ্র হলো তাঁর অন্যতম সাহিত্য নিদর্শন। এতে রয়েছে প্রেম ও মরমি ভাবধারাসম্বলিত অসংখ্য (৪৯৫) গজল। সমসাময়িক বাদশাগণের প্রশংসায় রচিত কয়েকটি কাসিদা। কিছু রুবায়ী ও দুটি মাসনাভী, যার একটি 'সাকীনামে' খ্যাত; অপরটি হলো প্রেমবিষয়ক। [হোমায়ী : ১৩৭৩ : ১১৩]

কুরআনের প্রতিফলন : বহুমুখি জ্ঞানের অতুলনীয় রত্নভাণ্ডার হিসেবে বিবেচিত হাফিজ-কাব্যে ফুটে উঠেছে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব জীবনের গভীর রহস্য। শেখ সাদির পরে হাফিজকেই শ্রেষ্ঠ ফারসি গজল বা গীতিকাব্য রচয়িতা বলে ভাবা হয়। প্রগাঢ় প্রেম ও গভীর আধ্যাত্মিকতায় সিক্ত তাঁর কবিতায় মুগ্ধ হয়েছেন বিশ্ববাসী। শরাব-সাকী, প্রেম-মদিরা, বসন্ত গোলাপ, প্রেমাস্পদের রূপমুগ্ধতা তাঁর মরমি সাধনার রূপক বর্ণনা হিসেবে ধরা দিয়েছে তাঁর কবিতায়। আত্তার ও রুমির অধ্যাত্মবাদ, সাদির মানবতাবোধ, সানায়ীর আত্মসমালোচনা ও সামাজিক মূল্যবোধের নির্যাসকে ধারণ করে আছে হাফিজের গজল।

হাফিজ-গবেষকগণের ভাষ্যমতে তিনি তাঁর জীবনের প্রায় চল্লিশ বছর কাটিয়েছেন মহাগ্রন্থ আল কুরআনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে। হাফিজ বলেন :

علم وفضلی که به چهل سال دلم جمع آورد
ترسم آن نرگس مستانه به یغما ببرد.

(গজল ১২৮, গানজুর)

দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সাধনায় আমার অন্তরে যে জ্ঞানবৈশিষ্ট্য সঞ্চিত হয়েছে, ভয় হয়, না জানি প্রেয়সীর চোখের চাহনি তা হরণ করে নিয়ে যায়।

(তারিক)

পবিত্র কুরআনে তাঁর এই অগাধ পাণ্ডিত্বের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কাব্যের প্রতিটি ছত্রে। কুরআনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণেই তিনি 'খাজা হাফিজ' অভিধায় বিভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর কাব্যসৌধের প্রতিটি ছত্রেই ঝংকৃত হয়েছে পবিত্র কুরআনের প্রতিধ্বনি। কবি বলেন:

ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ
که قرانی که اندر سینه داری

(গজল ১৭৮ গানজুর)

হে হাফিজ! তোমার বক্ষে সংরক্ষিত কুরআনের আভায় রচিত

কবিতার চাইতে সুন্দর বাণী আর কিছু দেখিনি।

কুরআন সাধনার মাধ্যম হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন প্রেমকে। তাঁর মতে প্রেম একটি ঐশী ও এরফানি চেতনা, যা মানুষকে তার প্রেমাস্পদ মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে উদ্বুদ্ধ করে, অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়, সৃষ্টি রহস্যের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবনে সহায়তা করে। হৃদয়মন তখন মহাপ্রভুর রং-এ রঞ্জিত হতে ব্যাকুল হয়। এই ব্যাকুল মন নিয়েই হাফিজ তাঁর কাব্যের অবকাঠামো নির্মাণ, সৌন্দর্যবর্ধক আলংকারিক দিকনির্দেশনা গ্রহণ এবং কবিতার ভাব-রস, তাল-লয় নির্ধারণের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহাগ্রন্থ আল কুরআনের দ্বারস্থ হয়েছেন। কুরআনের সৌন্দর্য সুষমায় তিনি তাঁর কবিতার ক্যানভাস সাজিয়েছেন নিপুণ শিল্পীর মতো।

পবিত্র কুরআনের ছন্দরীতি অনুসরণ : সাধারণত ছন্দবদ্ধ কবিতার অন্ত্যমিলকে উচ্চারণের সুবিধার্থে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে পড়ার নিয়ম-নীতিকে সাহিত্যের পরিভাষায় বাহার (بحر) বলে– যা 'এলমে আরুয' নামে পরিচিত। ফারসি ছন্দ বিশারদগণের মতে– পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহে এই ছন্দরীতি বিদ্যমান রয়েছে। বলা যায়, পবিত্র কুরআনের সেই ছন্দ ও শব্দ ব্যঞ্জনা থেকেই এই অলংকারশাস্ত্রের উৎপত্তি। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে প্রচলিত সেই বাহার ছন্দরীতিগুলো হলো– رمل রামাল, مضارعমোযারে, هزز হাযায, متقارب মোতাকারের প্রভৃতি। হাফিজ কুরআনের সেই অনিন্দ্যসুন্দর بحر ছন্দরীতি অবলম্বন করেই তাঁর কবিতার কাঠামো নির্মাণ করেছেন।

যেমন **বাহারে রামাল :**

فاعلاتن – فاعلاتی – فاعلاتن- فاعلن

এ ওজনটি পবিত্র কুরআনের যে আয়াতগুচ্ছ থেকে নেয়া হয়েছে তার একটি হচ্ছে–

ف اذکرو الله قیاما و قعودا وعلی جنوبکم

(অর্থ : অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর।) (অনুবাদ : মারেফুল কুরআন)

এ ওজনে রচিত হাফিজের কবিতা-

شاهدان گردلبری زین سان کنند
زاهدان را رخنه در ایمان کنند

[হাফেজ : ১৩৮৬ : ১১৬]

হৃদয়হারী প্রিয়া যদি করতে থাকে ছলচাতুরী
ক্ষণকালেই যাহেদগণের ফুটো হবে ঈমান তরী।

হাফিজের সবচাইতে প্রিয় ছন্দরীতিও এটি। তাঁর ৪৯৫টি গজলের

১৮০টিই এ রীতিতে রচিত। (সিরাজ : ১৩৬৮ : ৫৭) (জাহরা জামশিদী)

বাহারে হাযায :

مفاعيل – مفاعيلن – فعولن

কুরআনের আয়াত :

فان كان لكم كيد فكيدون

(অতএব, তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার কাছে।) (অনুবাদ : মারেফুল কুরআন)

এ ওজনে হাফিজের কবিতা :

شب تاريك و بيم موز گردابى چنين هايل
كجا دانند حال ما سبكباران ساحلها .

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ উত্তাল ঢেউয়ে আঁধার রাতে মাঝ সমুদ্রে থাকা

আমাদের অবস্থা তারা কিভাবে বুঝবে, যারা সমুদ্রতটে নিরাপদে অবস্থান করছে। [হাফিজ : ১৩৮৬ : ১]

বাহারে মোতাকারেব : فعولن – فعولن – فعولن – فعولن

পবিত্র কুরআনের বাণী : اقيمو الصلوة واتوالزكاة

(অর্থ : নামাজ প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর)

হাফিজের কবিতা : سلامى چوبوى خوش آشنايى
بدان مردم ديده روشنايى

(হাফিজ : ১৩৮৬; ২৯৪)

অর্থ : প্রিয় পরিচিত সেই সুগন্ধকে সালাম
যাতে মানুষ আলোর সন্ধান পায়। (জামশিদী : ১৩৯৯ : ৪৫, ৪৬, ৪৭)

কুরআনের আয়াত ও বিষয় অবতারণার পদ্ধতি অনুসরণ : তাঁর গযল গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় তিনি কবিতার চরণ বা শ্লোক উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও পবিত্র কুরআনের বর্ণনারীতির অনুকরণ করেছেন। আমরা পবিত্র কুরআনের কোন সূরা বা অধ্যায় পড়ার সময় দেখতে পাই যে, কুরআন বর্ণনা বিন্যাসে আয়াতগুলো পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত হলেও মাঝে মধ্যে ভিন্ন ও স্বাধীন অর্থবোধক কোন কোন আয়াত চলে আসে যেগুলোর অর্থ বিচারে সূরা বা অধ্যায়ের অংশ বলে মনে না হলেও সম্পূর্ণ অধ্যায় পাঠান্তে আয়াতগুলো যে সে অধ্যায় বা সূরার অবিচ্ছেদ্য অংশ তা সহজেই অনুমিত হয়। অর্থাৎ প্রতিটি আয়াতের একটি স্বাধীন অর্থ থাকলেও তা অধ্যায় বিন্যাসের অধীন থাকে। এ আয়াত বা আয়াতাংশের আংশিক অর্থ, সামষ্টিক সূরা অধ্যায়ের সার্বিক অর্থ হিসেবে পরিগণিত হয়।

হাফিজের গজলের শ্লোকগুলোর পারস্পরিক গঠন প্রক্রিয়াও তেমনি। কখনো কখনো কবিতার শ্লোক বর্ণনার ধারাবাহিকতায় একটি শ্লোকের সাথে অপর ছত্রের বিষয়বস্তুগত বাহ্যিক কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে পূর্ণ গজল পাঠ করলেই চরণসমূহের অর্থগত অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের সেই মিল পরিষ্কার বোঝা যায়। অর্থাৎ প্রতিটি শ্লোকের একটি স্বাধীন অর্থ থাকলেও সামষ্টিকভাবে একটি গজলেরই অরিচ্ছেদ অংশ বলে প্রতীয়মান হয়। (সায়েদী : ১৩৬৯; ১৮৬-৮৭)

এ কারণেই হাফিজ দাবি করেছেন–

صبح خيزى و سلامت طلبى چون حافظ
هرچه كردم همه از دولت قران كردم

হে হাফিজ! যদি সুস্থতা কামনা কর তবে প্রভাতে জেগে ওঠ
যা কিছুই করেছি তা সবই পবিত্র কুরআনের সম্পদের মাধ্যমেই করেছি।

কবিতায় পবিত্র কুরআনের আয়াত ও আয়াতাংশ সংযোগ : হাফিজ তাঁর গজলে শব্দ চয়ন, বাক্য বিন্যাস মমার্থ বর্ণনা ও পরিভাষা ব্যবহারেও কুরআনশৈলি দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। পবিত্র কুরআনের শব্দ ও বাক্য বিন্যাস, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, প্রবাদ-প্রবচন, এর শৈল্পিক ও নান্দনিক সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তাঁর কাব্যসৌন্দর্য বাড়িয়েছেন। এতে যেমন বেড়েছে তার কাব্যশোভা, অর্থে এসেছে গভীরতা, কবিতা হয়েছে শ্রুতিমধুর, পাঠক মহলে এসেছে মুগ্ধতা। অবশ্য কুরআনের জ্ঞানে আলোকিত ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন সাধারণের পক্ষে তাঁর কাব্যের এই রসবোধ আস্বাদন করা মোটেই সম্ভব নয়।

হাফিজ বলেন :

زحافظ جهان كس چو بنده جمع نكرد
لطائف حكمى با نكات قرانى (কাছিদে : ২ গানজুর)

জগতের মাঝে এমন হাফেজ পাবে নাকো খুঁজে
আমার মত যে কুরআনের তত্ত্বে, দর্শন বুঝে।
(শাহ নেওয়াজ : ০৩ জুন, ২০২০)

কুরআনের অলংকরণে সজ্জিত তাঁর গজলের কয়েকটি নমুনা নিম্নে তুলে ধরছি যাতে তিনি কুরআনের কোনো আয়াত বা আয়াতাংশ আত্মীকরণ করেছেন শৈল্পিকভাবে।

مده خاطر نازك ملامت ازمن زود
كه حافظ تو خود اين لحظه گفت بسم الله

(গজল : ২১৬, গানজুর)

সামান্য বিরক্তিতে দ্রুতই করো না তিরস্কার আমায়
হাফিজ! শুরু কর তোমার বক্তব্য বিসমিল্লায়।

سرم به دنيى وعقبى فرونمى آيد
تبارك الله از اين فطنه‌ها كه در سرماست

(গজল : ২২, সাঞ্জুর)

দুনিয়ার কুটকৌশল যত, শক্তিপূজা ও পরকালীন ভয়,
নত করেনি আমারে কভু, মুক্তিদাতা এ ফেতনায়
তাবারাকাল্লাহ আল্লাহ বরকতময়।

شب قدر است و طى شد نامه هجر
سلام فيه حتى مطلع الفجر [গযল ২৫১, গাঞ্জুর]

কেটে গিয়েছে যন্ত্রণা যত, কদরের মহিমায়,
ফজরেও তা রইবে বহমান রজনী প্রশান্তিময়।

عيشم مدام است از لعل دلخواه
كارم بكام است الحمد لله

চিরন্তন হয়েছে আরাম আয়েশ মোর প্রিয়ার সান্নিধ্য কামনায়,
স্বার্থক হয়েছে সকল প্রত্যাশা মোর পড় আলহামদুলিল্লাহ।
(গজল ২৪৪, গাঞ্জুর)

উপস্থিতি তো সান্নিধ্যের নির্জনতা আর বন্ধুদের সমাগম,
'ওয়া ইন ইয়াকাদু' তেলাওয়াত কর এবং দরজা খুলে দাও।

কুরআনের আয়াতের ভাবার্থ প্রয়োগ : হাফিজ পবিত্র কুরআনের আয়াত বা আয়াতাংশের ভাবার্থ নিয়েও কবিতা রচনা করেছেন। যেমন : মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবের ৭৩ নং আয়াতে শরীয়াতের বিধান সম্পর্কে বলেন :

'আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হলো, কিন্তু মানুষ তা বহন করা। নিশ্চয় সে জালিম ও অজ্ঞ।' (আহযাব : ৭৩)

হাফিজ বলেন :

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند
و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید

(গজল : ১৮৪, গানজুর)
আসমান পারেনি বহন করতে এই আমানত ভার
অবশেষে আমি পাগলের নামে এল ভাগ্যফল তার। (সেহাত : ২০১৮)

একইভাবে সূরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াতের ভাবার্থও তিনি এনেছেন তাঁর কবিতায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন : 'নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর সকল ফেরেশতা তাঁর নবীর উপর দরুদ, সালাম (রহমত) প্রেরণ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ সালাম পাঠ কর।' এই আয়াতের ভাবার্থকে উপজীব্য করে হাফিজ বলেন :

آسمان بار امانت نتوانست کشید
قرعه فال به نام من دیوانه زدند .

(রুবায়ী-৩, গানজুর)
বললাম, হাফিজ, তোমার যা বলার ছিল সবই বলা হয়ে গেছে।
আনন্দ কর! মনোহারী কথা যারা বলেন তাদের প্রতি দরুদ সালাম।

একইভাবে সূরা আনআমের ১০৩ নং আয়াতের ভাবার্থ : 'দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও সুবিজ্ঞ' ধারণ করে হাফিজ বলেন :

گفتم سخن توگفت حافظ گفتا
شادی لطیفه گویان صلوات ـ

(গজল ৩৯৪)

তোমার (কুদরতি) মুখ দেখতে, ঐ চোখ প্রয়োজন যা রুহানি জগৎ দেখতে পায়, আমার এ চোখ দুনিয়া দেখে যে, তোমায় দেখায় যোগ্য নয়।

কুরআনে বর্ণিত কাহিনীকেও তিনি তুলে এনেছেন তাঁর কবিতায়। হারিয়ে যাওয়া হযরত ইউসুফ (আ.) পুনরায় কেনানে ফিরে আসার গল্প বর্ণনা করে হতাশার দোলাচল থেকে মুক্তি কামনা করে তিনি বলেন :

دیدن روی تو را دیده جان بین باید
وین کجا مرتبهٔ چشم جهان بین من است

(গজল ২৫৫, গানজুর)

দুঃখ করোনা হারানো য়ুসুফ
কানানে আবার আসিবে ফিরে।
দলিত শুষ্ক এমরু পুন
হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে। (নজরুল)

তাই বলা যায়, হাফিজের 'দিভানে' অগণিত গজল ও অন্যান্য কবিতা রয়েছে যার ছত্রসমূহ পবিত্র কুরআনের আয়াত, আয়াতাংশ, ভাবধারা প্রয়োগে সমৃদ্ধ করেছেন। এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর জীবনের চল্লিশটি বসন্তকাল এ মহাগ্রন্থের অনুশীলন ও প্রশিক্ষণে কাটিয়েছিলেন বলে। দীর্ঘদিনের সেই লব্ধ অভিজ্ঞতার স্বার্থক প্রয়োগ করেছেন তাঁর কাব্যে। এতে তাঁর কবিতা হয়েছে আরো অর্থবহ, বেড়েছে আংগিক শোভা, ছন্দের মাত্রায় যোগ হয়েছে অভিনব রসবোধ। তাই তাঁর কাব্যের আবেদন এখনো চিরন্তন। 'লিসানুল গায়েব' খ্যাত হাফিজ যথার্থই বলেন :

ای چنگ فروبرده به خون دل حافظ
فکرت مگر از غیرت قران وخدا نیست

হাফিজের হৃদয় উতালা হয়েছে, সর্বগ্রাসী থাবায়,
চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটেছে কুরআন ও আল্লাহর ভাবনায়।

তথ্যসূত্র

১. কুরআনুল কারিম।
২. হাফেজ, শামসুদ্দিন মোহাম্মদ, (১৩৮৬) অসিম প্রকাশনা, তেহরান।
৩. হুমায়ী, আল্লামা জালালউদ্দিন, (১৩৭৩) তারিখে মোখতাসারে আদাবি, কোম, ইরান।
৪. হারুভী, হোসাইন আলি, (১৩৯২) শারহে গাযালহায়ে, তেহরান।
৫. সায়েদী, আব্দুল আজিজ, (১৩৬৯) বা' হাফেজ তা কাহকেশানে এরফার ভা আখলাক, শিরাজ।
৬. খানলরী, পারভেজ নাতেল, (১৩৬৮) ভাযনে শেরে ফারসি, তেহরান।
৭. শরিফ, বাবাক, বাহমানী, ফাতেমে, (১৩৯৫) এযাযে মুসেকিহায়ে কুরআন দার আয়নেয়ে এবরাতহায়ে মাওযুনে আরুযী। ফাসল নামে পাঝুহেশহায়ে আদাবি, চতুর্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।
৮. হাসান আনওয়ারী, (১৩৯২) সেদায়ে সোখানে এশক, তেহরান।
৯. জাহরা জামশিদী, (১৩৯৯) শেফায়ে দেল, ৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা (৩৭-৫০)
১০. বাহাউদ্দিন খোররামশাহী, (১৩৭৩) বারগোযিদেয়ে শারহে হাফেজ, তেহরান।
১১. মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ, (২০১০) পারশ্যপ্রতিভা, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।
১২. অধ্যাপক মনুসর উদ্দীন, (১৯৭৮) ইরানের কবি, ঢাকা।
১৩. ড. হাসান সেহাত, (২০১৮) নিউজলেটার, 'মানবতার উৎকর্ষ সাধনে সাধক কবি হাফিজ শিরাজী ও রবীন্দ্রনাথ', (অক্টোবর-নভেম্বর)
১৪. ড. তারিক সিরাজী, (২০১৮) নিউজলেটার, 'আধ্যাত্মিক কবি হাফিজ ও তাঁর কবিতা'। (অক্টোবর-নভেম্বর)
১৫. কাদের শাহনেওয়াজ, (২০২০) দৈনিক ইনকিলাব, 'মহাকবি শামসুদ্দিন হাফিজ : জীবন ও কর্ম', ৩রা জুলাই।

লেখক : অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

‘বাংলাদেশে ফারসি শিক্ষায় করোনা মহামারির প্রভাব’

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন

[গত ১৫-১৬ ডিসেম্বর ২০২০ ইরানের রাজধানী তেহরানে অনুষ্ঠিত ‘বিশ্বে ফারসি ভাষার শিক্ষা ও প্রসার : করোনা মহামারির প্রভাব’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যে বক্তব্য তুলে ধরেন নিউজলেটারের পাঠকবর্গের জন্য তা বাংলায় অনুবাদ করে নিম্নে উপস্থাপিত হলো।]

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। আজ আমাদের সেই বিজয় দিবস; এ উপলক্ষে আমি আপনাদের সকলকে আমার দেশের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই।

আপনারা জেনে খুশি হবেন, বাংলাদেশ ফারসি শিক্ষার জন্য এক উর্বর ভূমি। বাংলা ভাষা বহু ফারসি শব্দ ধারণ করে শক্তিশালী ও গতিশীল হয়েছে। অনুরূপভাবে এতদঞ্চলের কবি-সাহিত্যিকদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য ফারসি সাহিত্যের অনেক উপাদান গ্রহণ করে সমৃদ্ধ ও উপকৃত হয়েছে। প্রায় দশ থেকে বার হাজার ফারসি শব্দ বাংলা ভাষার সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। একইভাবে বাঙালি কবিদের উপর ফারসি কবিদের অবিশ্বাস্য প্রভাব রয়েছে। তাই আমরা বলি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের রয়েছে ব্যাপক অবদান। এতদ্ব্যতীত বাংলা ও ফারসির পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ মেলবন্ধন বঙ্গীয় অঞ্চলে হাজার বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশে মোটাদাগে দুই ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। একটি সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থা আর অন্যটি ধর্মীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য এতদুভয় পদ্ধতির শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই পড়ানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, যেমন দ্বীনি মাদ্রাসাসমূহ এবং দ্বিতীয়ত, দেশের সরকারি শিক্ষা-ব্যবস্থায়; যেমন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ। আমরা বলতে পারি, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ফারসির রয়েছে এক অনবদ্য ঐতিহ্য; যা আমাদের জন্য খুবই গৌরবের। সেটি হলো, দেশের সর্বপ্রাচীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন ও চর্চা; বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয় তার শতবর্ষ উদ্‌যাপন করছে। ১৯২১ সালের ১ জুলাই যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করে তখন থেকেই ফারসি বিভাগ ছিল; যাতে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে ফারসি পড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ও উর্দু বিভাগে উর্দুর প্রাধান্য চলে আসে। কিন্তু বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে আবারো ফারসির পুরনো ঐতিহ্য ফিরে আসতে থাকে এবং ১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামি বিপ্লব বিজয়ের পর থেকে ইরানের ঢাকাস্থ দূতাবাস ও কালচারাল সেন্টারের সর্বাত্মক সহযোগিতায় সর্বতোভাবে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এক নবজোয়ার বইতে থাকে। উল্লেখ্য যে, ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়; যা ফারসি ভাষার মাতৃপ্রতিম দেশ ইরানের সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। সেদিক বিবেচনায় বলতে পারি, এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, উচ্চশিক্ষায় ফারসির যাত্রা ইরানের আগেই আমাদের এই বাংলায় শুরু হয়েছিল!

বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বিএ, এমএ, এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশের তিনটি সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা, যথাক্রমে মাদ্রাসা-ই আলিয়া, ঢাকা, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও বগুড়া সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাসে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য রয়েছে এবং বেসরকারি কওমি মাদ্রাসায়ও ফারসি অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটেও ফারসি ভাষা কোর্স চালু আছে। এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার শিক্ষার্থী ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে পড়াশোনায় নিয়োজিত রয়েছে। কিন্তু করোনা মহামারির কবলে পড়ে সমগ্র দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মধ্যে পতিত হয়েছে।

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানাই, গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। ১৭ মার্চ ২০২০ হতে দেশের সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সরকারিভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়; আজ পর্যন্ত সেগুলো খোলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুদিন আমরা করোনা পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। এসময় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল ক্লাস ও পরীক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকে। পরবর্তীতে মে এবং জুন মাস হতে আমরা অনলাইন ক্লাস কার্যক্রম শুরু করি আর এভাবেই করোনা মহামারিতে দেশের ফারসি পরিবারও যথারীতি তাদের শিক্ষা কার্যক্রমে নিজেদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। দেশব্যাপী চলমান মহামারিতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা তাদের অ্যাকাডেমিক জীবন সচল রাখতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকেন। এক্ষেত্রে আমাদের ছাত্র-শিক্ষকদের সামনে অনেক সমস্যা এসে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আমরা সেগুলোর সমাধানে সাধ্যমতো আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি।

বাংলাদেশে ফারসি শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গত মার্চ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম দশক পর্যন্ত শুধু জুম ও অনলাইনে নানা মাধ্যমে ক্লাসসমূহ চালু ছিল। কিন্তু সমস্ত পরীক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ছিল। গত এক সপ্তাহে দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিত উপায়ে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে স্থগিত পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রেও নানা প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এর মধ্যে প্রথমেই ভাববার বিষয় হলো, দেশের নানা প্রান্ত হতে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে এসে কোথায় অবস্থান করবে এবং দ্বিতীয়ত, করোনা মহামারির এই দুঃসময়ে

বাকি অংশ ৩১ পাতায় দেখুন

ইরানি প্রবাদ বাক্য

شش دانگ غرق کاری بودن

উচ্চারণ : শিশ দা'ঙ্গ গারকে কা'রী বূদান

অর্থ : ছয় আনা কোনো কাজে ডুবে যাওয়া।

মর্মার্থ : ধ্যানমন একাগ্র করে কোনো কাজে ডুবে যাওয়া বুঝাতে সাধারণ কথাবার্তায় প্রবাদটি সর্বত্র ব্যবহৃত হয়।

شش ماهه به دنیا آمده

উচ্চারণ : শিশ মা'হে বে দুনয়া' আ'মাদে

অর্থ : ছয় মাস হলো দুনিয়ায় এসেছে।

মর্মার্থ : কেউ কাজকর্ম খুব তাড়াহুড়ায় আঞ্জাম দিচ্ছে, এখনো বাচ্চা মানুষ, এ কথা বুঝাতে এই প্রবাদের প্রচলন ব্যাপক।

شق القمر کردن

উচ্চারণ : শাক্কুল কামার কার্দান

অর্থ : চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করা।

মর্মার্থ : খুবই কষ্টকর কোনো কাজ সম্পাদন করা, বিস্ময়কর কোনো কাজ আঞ্জাম দেয়া অর্থে এই প্রবাদের প্রচলন ব্যাপক।

شکراب میان دو نفر شدن

উচ্চারণ : শেকারা'ব মিয়া'নে দো নাফার শোদান

অর্থ : দু জনের মাঝে চিনির পানি হওয়া।

মর্মার্থ : দুই বন্ধুর মাঝখানে মনোমালিন্য হয়েছে বা দু জনের সম্পর্কের মাঝে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়েছে এমনটি বুঝাতে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

شکسته نفسی کردن

উচ্চারণ : শেকাস্তে নাফসী কার্দান

অর্থ : নফস ভেঙে গেছে এমন দেখানো।

মর্মার্থ : বিনয় প্রকাশ, নিজেকে প্রকাশ না করার ভাবার্থ বুঝানোর জন্য এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, লোকটি শেকাস্তা নফসী করছে। নিজের যোগ্যতা গোপন করে বিনয় প্রকাশ করছে।

شکم خود را صابون زدن

উচ্চারণ : শেকামে খোদ রা' সা'বূন যাদান

অর্থ : নিজের পেটে সাবান দেয়া

মর্মার্থ : কিছুদিন ক্ষুধার ঘানি টানার পর খাওয়ার জন্য নিজকে প্রস্তুত করেছে। খাওয়ার রুচি ঠিক করে নিয়েছে– এই ভাবার্থটি প্রকাশ করার জন্য প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

شکمش گوشت نو بالا آورده

উচ্চারণ : শেকামাশ গূশতে নূ বা'লা' আ'ওয়ার্দে

অর্থ : তার পেটে নতুন গোশত ফুলে উঠেছে।

মর্মার্থ : তার কায়কারবার বেশ জমে উঠেছে, নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, অতীতের কথা ভুলে গেছে, নিজেকে নিয়ে বেসামাল– এ ভাবটি ফুটিয়ে তোলার জন্য উপরোক্ত প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

অনুবাদ : ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের ব্যবহার

সংকলন : ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ
সম্পাদনা : আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

বাংলা রূপ	ফারসি রূপ	আধুনিক ফারসি উচ্চারণ
কিসমিস	کشمش	কেশমেশ
কম	کم	ক্যাম
কামান	کمان	কা-মন
কমবখত	کم‌بخت	কাম-বাখ্‌ত্‌
কম খরচ	کم خرج	ক্যাম-খার্‌জ্‌
কমদিল	کم‌دل	ক্যাম-দেল
কোমর	کمر	কামার
কোমরবন্দ	کمربند	কামারবান্দ
কমজোর	کم‌زور	কাম-যূর
মশক	مشک	মাশ্‌ক্‌
মুশকিল	مشکل	মোশকেল
মশহুর	مشهور	মাশহূর
মোশওয়ারা	مشوره	মাশ্‌ভরেহ্‌
মোসাহেব	مصاحب	মো-সহেব
মোসাফাহা	مصافحه	মো-সফেহে
মিসর	مصر	মেস্‌র
মোসলেহ	مصلح	মোসলেহ্‌
মুসলেহাত	مصلحت	মাস্‌লাহাত
মোসাল্লা	مصلّا	মোসাল্লা
মোতাবেক	مطابق	মো-তবেক
মোতালা	مطالعه	মো-তলেয়ে
মতলব	مطلب	মাতলাব
নতীজা	نتیجه	নাতিজে
নযর	نذر	নায্‌র
নযরানা	نذرانه	নায-রনে
নর	نر	নার
নার্গিস	نرگس	নারগেস
নরম	نرم	নার্‌ম
নরমতনু	نرم تن	নার্‌ম-তান
নরমদিল	نرم دل	নার্‌ম দেল
নসব	نسب	নাসাব
নিসবত	نسبت	নেসবাত
নসবনামা	نسب نامه	নাসাব নমে
নসবী	نسبی	নাসাবী
নোসখা	نسخه	নোসখে
নসল	نسل	নাস্‌ল
নসীম	نسیم	নাসীম

স্মরণীয় দিবস

১ অক্টোবর : বাংলাদেশের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ.)-এর মৃত্যুবার্ষিকী।

৫ অক্টোবর : হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.) ইরাক থেকে ফ্রান্সে হিজরত করেন (১৯৭৮)।

৮ অক্টোবর : ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শাহাদাতের চল্লিশতম দিবস (আরবাইন)।

১২ অক্টোবর : বিশ্ববিখ্যাত কবি হাফিজ স্মরণে দিবস।

১৫ অক্টোবর : বিশ্ব সাদাছড়ি দিবস (অন্ধদের কল্যাণে)।

১৬ অক্টোবর : সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওফাত দিবস।

* আহলে বাইতের ধারার দ্বিতীয় ইমাম ও বেহেশতের যুবকদের নেতৃদ্বয়ের প্রথম ব্যক্তিত্ব ইমাম হাসান (আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী।

১৭ অক্টোবর : আহলে বাইতের ধারার অস্টম ইমাম আলী ইবনে মূসা আর-রেযা (আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী।

* বাংলাদেশের মরমি বাউল সংগীতের জনক লালন শাহের মৃত্যুবার্ষিকী।

১৯ অক্টোবর : বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ফররুখ আহমদের মৃত্যুবার্ষিকী।

২৪ অক্টোবর : উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, সাহিত্যিক, সাংবাদিক মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর মৃত্যুবার্ষিকী।

২৬ অক্টোবর : ইমাম হাসান আল-আসকারী (আ.)-এর শাহাদাত দিবস।

*অবিভক্ত বাংলার নেতা প্রজাতিহৈষী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের জন্মবার্ষিকী।

২৯ অক্টোবর : কবি বেনজীর আহমদের জন্মবার্ষিকী।

* কবি তালিম হোসেনের জন্মবার্ষিকী।

* কিশোর (১৩ বছর) মুহাম্মাদ হুসাইন ফাহমিদেহ এর শাহাদাত দিবস। ইরানে এটি কিশোর স্বেচ্ছাসেবী দিবস হিসেবে পালিত হয়।

৩০ অক্টোবর : মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জন্মদিবস (আহলে সুন্নাতের রেওয়ায়েত অনুযায়ী) ও ইসলামি ঐক্য সপ্তাহের শুরু (১২-১৭ রবিউল আউয়াল)।

৪ নভেম্বর : মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জন্মদিবস (আহলে বাইতের ধারায় বর্ণনা অনুযায়ী) ও আহলে বাইতের ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদেক (আ.)-এর জন্মদিবস।

৬ নভেম্বর : বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক শাহেদ আলীর মৃত্যুবার্ষিকী।

১১ নভেম্বর : ইতিহাসখ্যাত সাহিত্যিক 'বিষাদ সিন্ধু'র রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেনের জন্মদিবস।

১৪ নভেম্বর : বিশ্ব ডায়াবেটিক রোগীদের সহায়তা দিবস।

১৫ নভেম্বর : বিশ্ব পুস্তক ও পুস্তক পাঠ দিবস, বিশ্ব গণমাধ্যম দিবস।

১৭ নভেম্বর : বাংলাদেশের মযলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী।

১৯ নভেম্বর : অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর শহীদ মীর নিসার আলী তিতুমীরের শাহাদাত বার্ষিকী।

* আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস।

২০ নভেম্বর : বাংলাদেশের প্রখ্যাত মহিলা কবি সুফিয়া কামালের মৃত্যুবার্ষিকী।

২৩ নভেম্বর : ইমাম হাসান আসকারী (আ.)-এর জন্মদিবস।

৩০ নভেম্বর : শেখ মুফিদ (র.) স্মরণে দিবস।

১ ডিসেম্বর : বিশ্ব এইড্স প্রতিরোধ দিবস।

২ ডিসেম্বর : শিল্পী কামরুল হাসানের জন্মদিন।

৩ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের কচিকাঁচার আসরের প্রতিষ্ঠাতা রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাইয়ের মৃত্যুবার্ষিকী।

* বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস।

৫ ডিসেম্বর : অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী।

১৬ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর এই দিনে বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে।

* বিশ্ব গবেষণা দিবস।

১৮ ডিসেম্বর : ড. মুহাম্মাদ মুফাত্তেহর শাহাদাত দিবস। এ দিবসটি ইরানে 'ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (হাওযা) ও বিশ্ববিদ্যালয় এর মধ্যে ঐক্য দিবস' হিসাবে পালিত হয়।

২১ ডিসেম্বর : ইরানে বছরের সবচেয়ে দীর্ঘতম রাত (শাবে ইয়ালদা)

২৫ ডিসেম্বর : হযরত ঈসা (আ.)-এর পবিত্র জন্মদিবস।

২৭ ডিসেম্বর : প্রলয়ংকরী সুনামীর বার্ষিকী। এ দিনে ভয়াবহ সুনামীতে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপসহ এ অঞ্চলের দেশগুলোর কয়েক লাখ লোক মৃত্যুবরণ করে।

সংবাদ বিচিত্রা

বিশ্বনবী (সা.)-এর অবমাননার প্রতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ন্যক্কারজনক : ইরানের সর্বোচ্চ নেতা

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে গত ৩ নভেম্বর ২০২০ ইরানি জনগণের পাশাপাশি গোটা মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন। এতে তিনি আবারো ফ্রান্সে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন পুনঃপ্রকাশ এবং এর প্রতি দেশটির সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার তীব্র নিন্দা জানান।

তিনি বলেন, একজন কার্টুনিস্ট যখন এ ধরনের অবমাননাকর কাজ করে কিংবা একটি পত্রিকা যখন তা প্রকাশ করে তখন বিষয়টি একরকম থাকে আর যখন সেই দেশের সরকারের পক্ষ থেকে এই কুকর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয় তখন সেটি অনেক বেশি জঘন্য চরিত্র ধারণ করে। ফ্রান্সের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এই ন্যক্কারজনক অপকর্মকে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়েছে।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেন, তবে আশার কথা মুসলিম বিশ্ব নীরব থাকেনি। প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের সর্বত্র মুসলমানরা তাদের ঈমানি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তারা তাদের প্রাণপ্রিয় নবীর অবমাননার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন।

আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী বলেন, ফ্রান্স দাবি করে, মানবাধিকার ও বাক-স্বাধীনতার কারণে তারা এ কাজ করছে। অথচ এই ফ্রান্স উগ্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়। ফ্রান্স ইরানের সন্ত্রাসী মোনাফেকিন গোষ্ঠীকে সব রকম সহযোগিতা করেছে এবং এই গোষ্ঠী আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতিসহ ১৭ হাজার ইরানিকে হত্যা করেছে।

তিনি বলেন, এই ফ্রান্স বন্য জন্তুতুল্য ও রক্তপিপাসু (ইরাকের সাবেক শাসক) সাদ্দামকে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। প্যারিস প্রকাশ্যে এই সহযোগিতা দিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে। সেই নির্লজ্জ ফ্রান্স এখন বাক স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের বুলি আওড়ায়।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেন, বিগত বছরগুলোতে আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে বিশ্বনবীর (সা.) অবমাননা বারবার করা হয়েছে। কিন্তু এসবের মাধ্যমে তারা মহানবীর মর্যাদার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারেনি। যেভাবে মক্কা ও তায়েফের কাফেররা একদিন তাদের অপতৎপরতার মাধ্যমে বিশ্বনবী কিংবা ইসলামের ক্ষতি করতে পারেনি বর্তমানেও পশ্চিমা বিশ্ব এই মহান নবী (সা.) বা ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী বলেন, এখান থেকে পশ্চিমাদের কথিত সভ্যতার কদার্য দিকটি ফুটে উঠেছে। তাদের কাছে উন্নত প্রযুক্তি থাকায় তাদের এই পাশবিক ও বর্বর চেহারা ঢেকে রাখলেও মাঝেমধ্যে তাদের প্রকৃত চেহারা বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। কয়েক শতাব্দী ধরে তারা এই কথিত সভ্যতার দাবি করে আসলেও তাদের অসভ্যতা ও বর্বরতা বিশ্ববাসীর কাছে দিনদিন স্পষ্ট হয়ে পড়ছে।

ইসলামি ঐক্য সপ্তাহ

আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী তাঁর ঈদে মিলাদুন্নবীর ভাষণে আরো বলেন, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম খোমেইনী (রহ.) বর্তমানে ইমামের আহ্বান অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। ইমাম যখন এই ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেদিন মুসলিম বিশ্বের বহু নেতা এই আহ্বানের গুরুত্ব উপলব্ধি করেননি। আবার অনেকে উপলব্ধি করেও শুধু বিদ্বেষের কারণে তাতে সাড়া দেননি।

কিন্তু আজ মুসলিম বিশ্বে যেসব ঘটনা ঘটছে তাতে উপলব্ধি করা যায়, মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য কতটা জরুরি ছিল। আজ ফিলিস্তিন সংকটকে ইহুদিবাদী ইসরাইলকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা চলছে। ফিলিস্তিন মুসলিম বিশ্বের প্রধান সংকট হলেও সেটি থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি সরিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। কিন্তু এসব অপচেষ্টায় কোনো কাজ হবে না। ফিলিস্তিন একদিন মুক্ত হবেই।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেন, যে ইহুদিবাদী ইসরাইল ফিলিস্তিনি জাতির ভূমি দখল ও হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে সেই ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং সম্পর্ক স্থাপন করে তৃপ্তির হাসি হাসা চরম ন্যক্কারজনক ঘটনা। এর চেয়ে অপমান আর হতে পারে না।

তিনি বলেন, ইমামের আহবানের গুরুত্ব মুসলমানরা উপলব্ধি না করলেও ইসলামের শত্রুরা বুঝতে পেরেছে। এ কারণে তারা ইসলামের বিভিন্ন মাজহাবের মধ্যে যাতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা না হয় সেজন্য থিংক ট্যাংক প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকে বিভেদ সৃষ্টির সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছে। কীভাবে মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য আরো বেশি উসকে দেয়া যায় তারা সারাক্ষণ সে চেষ্টা চালাচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্ব এই বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টার অংশ হিসেবে দায়েশ (আইএস) সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু এই দায়েশকে মধ্যপ্রাচ্যের যেসব আরব দেশ অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সমর্থন দিয়েছে তাদের অপরাধ অনেক বেশি। যেসব সন্ত্রাসী মানবতাবিরোধী অপরাধ চালিয়েছে তাদের চেয়ে যারা তাদেরকে সব ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে তাদের অপরাধ বহুগুণ বেশি।

কাশ্মির থেকে লিবিয়া পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের যত সংকট আছে তার সব সংকটের সমাধান মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্ভব বলে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মন্তব্য করেন।

ভাষণে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়েও কথা বলেন আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী। মার্কিন গণতন্ত্রকে যারা মডেল হিসেবে তুলে ধরে তাদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এখন প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে আছেন তিনি বলছেন, আমেরিকার ইতিহাসে এর চেয়ে বেশি কারচুপির ফাঁদ আর কখনো তৈরি করা হয়নি। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হবে বলে তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন।

আর নির্বাচনের অপর প্রার্থী বলছেন, ট্রাম্প বড় ধরনের কারচুপির চেষ্টা করছেন। এই হচ্ছে, মার্কিন গণতন্ত্রের উদাহরণ। আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী বলেন, যে ব্যক্তিই নির্বাচিত হোক না কেন তাতে আমেরিকা পতন ঠেকানো সম্ভব হবে না। আজ না হোক কাল আমেরিকার পতন হবেই।

ইরানের সঙ্গে আমেরিকার শত্রুতা

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেন, তাঁর দেশের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার শত্রুতা থেমে নেই। আমেরিকার কোনো সরকার আমাদেরকে সহযোগিতা করবে না। আমাদেরকে অভ্যন্তরীণভাবে শক্তিশালী হতে হবে।

আমেরিকাকে হতাশ করে দিতে হবে। ইরানের জনগণ নিষেধাজ্ঞার ক্ষতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে। এজন্য তিনি ইরানি জনগণকে ধন্যবাদ জানান।

আর্মেনিয়া-আজারবাইজান যুদ্ধ

ভাষণের শেষাংশে তিনি নাগরনো-কারাবাখের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মধ্যকার চলমান যুদ্ধের ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এর অবসান দরকার। আজারবাইজানের যেসব ভূখণ্ড আর্মেনিয়া দখল করে নিয়েছে তা ছেড়ে দিতে হবে। এটি আজারবাইজানের অধিকার।

সেইসঙ্গে এই ভূখণ্ডে যেসব আর্মেনীয় জনগোষ্ঠী বসবাস করেন তাদের অধিকারও সমুন্নত রাখতে হবে। এ ছাড়া, এই যুদ্ধের সুযোগে কেউ যদি ইরান সীমান্তে সন্ত্রাসীদের জড়ো করার চেষ্টা করে তাহলে সেসব সন্ত্রাসীকে কঠোর হাতে দমন করা হবে।

সর্বোচ্চ নেতার ভাষণ রেডিও ও টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

রাসূল (সা.)-এর অবমাননা মানবীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবমাননার শামিল : ইরান

ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি বলেছেন, ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর যেকোনো ধরনের অবমাননা করা প্রকারান্তরে মানবীয় মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও স্বাধীনতাকে অপমান করার শামিল। তিনি বিশ্বনবী (সা.)-এর পবিত্র জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মুসলিম দেশগুলোর নেতাদের কাছে পাঠানো এক শুভেচ্ছা বার্তায় এ মন্তব্য করেন।

গত অক্টোবর মাসে ফরাসি পত্রিকা 'শালি এবদো' মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী (সা.)-এর ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন পুনঃপ্রকাশ করার পর বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের যে ঝড় উঠেছে সেদিকে ইঙ্গিত করে প্রেসিডেন্ট রুহানি এ মন্তব্য করেন। এসব অবমাননাকর কার্টুন ২০০৫ সালে একটি ড্যানিশ পত্রিকা প্রথম প্রকাশ করে এবং ২০০৬ সালে এই 'শার্লি এবদো' পত্রিকাই এগুলো একবার পুনঃপ্রকাশ করেছিল।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতাসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রায় সব কর্মকর্তা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবমাননার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। এছাড়া, ইরানের সাধারণ জনগণ গত বেশ কয়েকদিন ধরে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রাজপথে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট রুহানি তাঁর বার্তায় আরো বলেন, মহনবী (সা.) ছিলেন সর্বোত্তম পুরুষ এবং গোটা বিশ্বের জন্য রহমত। এমন একজন আদর্শ পুরুষের অবমাননা সব ধরনের নীতি-নৈতিকতার অবমাননার শামিল। তিনি বলেন, 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান এই ঘৃণিত পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং একই কাজ করার জন্য সব মুসলিম দেশের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।'

আহলে সুন্নাতের বর্ণনা অনুযায়ী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা.) ১২ রবিউল আউয়াল ধূলির ধরায় আগমন করেন। তবে শিয়া মাজহাবের বর্ণনায় বলা হয়েছে, মানবতার মুক্তির দূত ১৭ রবিউল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মদিবস নিয়ে এই মতপার্থক্য যাতে শিয়া ও সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ তৈরি করতে না পারে সেজন্য ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম খোমেইনী (রহ.) প্রতি বছর ১২ রবিউল আউয়াল থেকে ১৭ রবিউল আউয়াল পর্যন্ত সময়কে ঐক্য সপ্তাহ পালন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে গত চার দশক ধরে ইরানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঐক্য সপ্তাহ পালিত হয়ে আসছে।

বিশ্বনবীকে অবমাননার নিন্দা ও ফ্রান্সের যুবকদেরকে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার কিছু প্রশ্ন

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী ফরাসি তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'আপনারা আপনাদের প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করুন কেন তিনি একজন আল্লাহর রাসূলকে অবমাননা করার পক্ষে অবস্থান নিলেন? এবং কেন এটাকে তিনি বাকস্বাধীনতা বলছেন?

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ফরাসি যুবকদের উদ্দেশ্যে দেয়া বাণীতে প্রশ্ন করেছেন, পবিত্র ও ঐশী ব্যক্তিত্বদেরকে অপমান অপদস্থ করাই কি বাকস্বাধীনতা? তিনি আরো বলে, ফ্রান্সের যেসব মানুষ ম্যাক্রনকে

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছেন ম্যাক্রন সেই সব মানুষকে তাঁর এই বোকামিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মূলত তাদেরকে কি অপমান করেননি? ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আরো প্রশ্ন করেন, তথাকথিত ইহুদি নিধনযজ্ঞের কল্পকাহিনী বা হলোকাস্টের বিরুদ্ধে কথা বলাকে কেন অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়? যদি কেউ হলোকাস্টের বিষয়ে প্রশ্ন তোলে কিংবা সন্দেহ করে অথবা অস্বীকার করে তাহলে কেন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়? অথচ বিশ্বনবীকে অবমাননার ঘটনাকে বাকস্বাধীনতা বলে দাবি করা হচ্ছে!

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন সম্প্রতি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে অবমাননা করে ব্যাঙ্গচিত্র প্রকাশের বিষয়টিকে সমর্থন করে বক্তব্য দেয়ার পর বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। এরপরও ওই দেশটির সরকার এটাকে বাকস্বাধীনতা বলে দাবি করছে। এমনকি পাশ্চাত্যের আরো অনেক দেশও এটাকে বাকস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার বলে দাবি করছে। ফ্রান্সসহ পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ইসলাম ভীতি ছড়ানোর মাত্রা বহুগুণে বেড়েছে, অথচ এ ধর্ম রহমত, শান্তি ও বন্ধুত্বের বার্তা বয়ে এনেছে।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হচ্ছেন মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু এবং এমনকি এ ধর্ম অন্যান্য ঐশী ধর্মের প্রতিও সম্মান দেখাতে বলে। সব ধর্মেই উগ্রপন্থাকে ঘৃণা ও নিন্দা জানানো হয়। তাই কারোরই উচিত নয় রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য উগ্রস্থীদেরকে হাতিয়ার বা অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা। কিন্তু ফরাসি কর্মকর্তারা এ অপকর্মটিই করছেন। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রন বাকস্বাধীনতার দোয়াই দিয়ে বিশ্বনবীকে অবমাননা করার যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন তার কোনো ব্যাখ্যা থাকতে পারে না এবং তাঁর এ আচরণ সব ধর্মের মধ্যে গঠনমূলক সহযোগিতা, সহাবস্থান ও শান্তির জন্য সহায়ক নয়।

ইরাকের খ্রিস্টান পাদ্রি কার্ডিনাল মার লুইস রাফায়েল সাকু এক বিবৃতিতে বলেছেন, সব ধর্মের লক্ষ্য হওয়া উচিত ঘৃণা ও সহিংসতার পরিবর্তে পারস্পরিক ভালোবাসা, শান্তি, সহযোগিতা ও জনগণের মধ্যে আস্থার পরিবেশ তৈরি করা।

পর্যবেক্ষকরা বলছেন, মুসলমানদের ব্যাপারে ফরাসি প্রেসিডেন্টের আচরণ কোনো ধর্মেরই নীতি আদর্শের মধ্যে পড়ে না এবং তিনি সারা বিশ্বের জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। প্রেসিডেন্টের পদে বসে বাকস্বাধীনতার ব্যাপারে ম্যাক্রণের দ্বিমুখী নীতি সেদেশের জনগণের প্রতি অবমাননা যারা কিনা তাঁকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে। কারণ, বাকস্বাধীনতার অর্থ অন্য ধর্মের প্রতি অবমাননা করা নয়।

বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, ফরাসি প্রেসিডেন্ট খুব সহজে বিশ্বনবীকে অবমাননার ঘটনাকে সমর্থন করেছেন। অথচ ওই দেশটিতেই হলোকাস্টের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা যায় না এবং এটাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

সারা দেশে পালিত হয়েছে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)

যথাযথ মর্যাদায় গত ৩০ অক্টোবর বাংলাদেশে উদ্‌যাপিত হয়েছে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল মাসে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদের কাছে ১২ রবিউল আউয়াল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণময় দিন।

বাংলাদেশে দিনটি সরকারি ছুটির দিন এবং দেশের মুসলিমরা এ দিন বিশেষ ইবাদত করেন। দিনটি উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল, আলোচনা ও কোরআন খতমসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, মসজিদ ও মাদরাসা।

এক তথ্য বিবরণীতে পিআইডি জানায়, বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে জাতীয়ভাবে ঈদে মিলাদুন্নবী পালন শুরু করেন।

ঈদে মিলাদুন্নবী পালন উপলক্ষে ২৯ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত ১৪ দিনব্যাপী বিশেষ কর্মসূচি হাতে নেয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

‘শত্রুরা কখনোই ইসলামের নূরকে নিভিয়ে দিতে পারবে না’

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মাদ রেজা নাফার বলেছেন, শুত্রুরা যত চেষ্টাই করুক না কেন তারা কখনোই ইসলামের নূরকে নিভিয়ে দিতে পারবে না। বরং দিন দিন তা আরও প্রজ্বলিত হবে। গত ২ নভেম্বর ২০২০

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ও ইসলামি ঐক্য সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত এই ওয়েবিনারে রাষ্ট্রদূত বলেন, পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস এজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, এমাসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সমগ্র মানবজাতির রহমতস্বরূপ পৃথিবীতে আগমন করেন। তাঁর সৃষ্টি গোটা সৃষ্টিজগৎ ও মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় ঘটনা।

হাদিসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'হে নবী! আপনাকে যদি সৃষ্টি না করতাম তাহলে পৃথিবীর কোনো কিছুই সৃষ্টি হতো না।' তাই আমাদের কাছে এই প্রিয় নবীর জন্মদিনের চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে?

পৃথিবীতে তাঁর শুভাগমন আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় ঈদ। যদিও ইসলামের বিভিন্ন মাজহাবের মধ্যে তাঁর জন্মদিন নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো মাজহাবের মতে ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূলের জন্মদিন আবার কোনো কোনো মাজহাবের মতে ১৭ই রবিউল আউয়াল হলো রাসূলের জন্মদিন। সুতরাং এ ধরনের বিষয় মুসলমানদের মধ্যে যাতে কোনো বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য ইরানের ইসলামি বিপ্লবের রূপকার ইমাম খোমেইনী (রহ.) ১২ই রবিউল আউয়াল থেকে ১৭ই রবিউল আউয়ালকে ইসলামি ঐক্য সপ্তাহ হিসেবে ঘোষণা করেছেন যাতে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

মোহাম্মাদ রেজা নাফার বলেন, মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য যখন অত্যন্ত জরুরি তখন তাদের একটি অংশ ইহুদি-নাসারাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ফিলিস্তিনের মুসলমানরা যখন ইহুদিবাদী ইসরাইল কর্তৃক চরম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তখন সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন ও সুদানের মতো মুসলিম দেশ এই অবৈধ রাষ্ট্রের সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের ঘোষণা দিয়ে ফিলিস্তিনের মুসলিম ভাইদের যন্ত্রণাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্ব দুটি ভয়াবহ ভাইরাসে আক্রান্ত। একটি প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস এবং আরেকটি ইসলাম আতঙ্ক। পশ্চিমারা গত দুই দশক ধরে ইসলামের সাথে দ্বন্দ্বের পথ বেছে নিয়েছে। ফ্রান্সে রাসূল (সা.)-কে নিয়ে অবমাননাকর কার্টুন প্রকাশ করাই তার প্রমাণ।

কেন ফ্রান্স আজ ইসলামের দুশমনের পতাকাবাহী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে? কারণ, তারা ইসলামকে ভয় পায়। ফ্রান্সের একজন খ্রিস্টান ধর্মজাজক সম্প্রতি বলেছেন, ফ্রান্স আগামী দিনে মুসলিম দেশে পরিণত হবে। আমাদের সকল শিশু ভবিষ্যতে মুসলমান হয়ে যাবে। ইসলাম সকল জায়গায় বিস্তৃত হবে। দুনিয়ার প্রায় ৫০ শতাংশ শিশুর নাম মুহাম্মাদ। যদি আমরা এ ব্যাপারে এখনই পদক্ষেপ না নেই তাহলে ইসলাম ইউরোপেও বিজয়ী হবে।

আইরিশ নাট্যকার ও রাজনীতিবিদ জর্জ বার্নার্ড শ যিনি ৭০ বছর আগে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁর দুটি বইয়ে লিখেছেন, আমি ভাবিষ্যদ্বাণী করছি যে, আগামী দিনে ইউরোপ মুহাম্মাদ (সা.)- এর ধর্মের দিকে ফিরে যাবে। মুহাম্মাদ (সা.) ব্যতীত আর

কেউই বিশ্বের সমস্যার সমাধান দিতে পারবে না। সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি রাসূল (সা.)-এর অবমাননার পিছনে মূল কারণ কী। তিনি বলেন, ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতার বিষয়টি আজ আর কোনো মুসলমানের কাছেই গোপন নয়। ইসলামের শত্রুরা আজ প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে নেমেছে। কারণ, ইসলামি বিশ্বের শক্তি আগের চেয়ে আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে মুসলমানরা আজ দু-ধারবিশিষ্ট তলোয়ারের মুখে পড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ছে। তাই মুসলমানদের এই সংকট থেকে মুক্তির জন্য ঐক্যের বিকল্প নেই।

ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ড. মাওলানা এ. কে. এম মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর ড. সাইয়্যেদ হাসান সেহাত।

অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক পরিচালক ডা. খিজির হায়াত খান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. মুহিবুল্লাহ সিদ্দিকী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সাবেক চেয়ারমান ড. মোঃ আতাউল্ল্যাহ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আবু আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে নাতে রাসুল পাঠ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের ছাত্র হাসান কিবরিয়া। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন।

পরমাণুবিজ্ঞানী হত্যার পর যে বার্তা দিলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পরমাণু বিজ্ঞানীকে হত্যার সঙ্গে জড়িত সবার শাস্তি নিশ্চিত করতে বলেছেন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী।

তিনি বলেছেন, এ ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধা-সন্দেহের অবকাশ নেই। পরমাণু বিজ্ঞানী মোহসেন ফাখরিজাদেহর শাহাদাত উপলক্ষে এক বার্তায় তিনি গত ২৮ নভেম্বর ২০২০ এ কথা বলেন।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আরও বলেন, এই হত্যাকাণ্ড যারা ঘটিয়েছে এবং যারা এর পেছনে রয়েছে তাদের সবার শাস্তি নিশ্চিত করতে

হবে। একই সঙ্গে তিনি বিজ্ঞান, গবেষণা ও কারিগরি ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞানীর পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী বলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও অবদানের কারণে এই মহান বিজ্ঞানীকে হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহ তাঁকে কবুল করেছেন। তিনি শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছেন। এটা তাঁর জন্য ঐশী পুরস্কার। উল্লেখ্য, গত ২৭ নভেম্বর ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের রিসার্চ ও ইনোভেশন সংস্থার প্রধান মোহসেন ফাখরিজাদেহ সন্ত্রাসী হামলায় শহীদ হন।

মরণোত্তর সামরিক পদক পেলেন শহীদ পরমাণুবিজ্ঞানী ফাখরিজাদে

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী সম্প্রতি সন্ত্রাসী হামলায় শহীদ শীর্ষ পরমাণুবিজ্ঞানী মোহসেন ফাখরিজাদেকে মরণোত্তর সামরিক পদকে ভূষিত করেছেন।

গত মাসের শেষদিকে ইরানের রাজধানী তেহরানের অদূরে এক সন্ত্রাসী হামলায় ফাখরিজাদে নিহত হন। এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডের জন্য ইহুদিবাদী ইসরাইলকে দায়ী করেছে তেহরান।

ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল মোহাম্মাদ বাকেরি গত ১৩ ডিসেম্বর ফাখরিজাদের বাসভবনে গিয়ে তাঁর পরিবারের কাছে সর্বোচ্চ নেতার স্বাক্ষরিত 'ফার্স্ট ক্লাস অর্ডার অব নাস্‌র [বিজয়]' পদক হস্তান্তর করেন।

এ সময় জেনারেল বাকেরি বলেন, ইসলামি বিপ্লব এবং ইরানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে এই পদক প্রদান করা হলো। পদক প্রদানের সময় ইরানের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন সামরিক কমান্ডার জেনারেল বাকেরিকে সঙ্গ দিচ্ছিলেন।

তিনি আরও বলেন, সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা এবং লজিস্টিক অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে এটি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ পদক। ফাখরিজাদে শহীদ হওয়ার পর ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আমির হাতামি তাঁকে উপ প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।

জেনারেল বাকেরি আরো বলেন, উপযুক্ত সময় ও স্থানে এই শীর্ষ পরমাণুবিজ্ঞানী হত্যার প্রতিশোধ নেয়া হবে।

আইআরজিসিতে যুক্ত হলো নতুন যুদ্ধজাহাজ

ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি'র নৌ ইউনিটে গত ১৯ নভেম্বর ২০২০ যুক্ত হয়েছে নতুন যুদ্ধজাহাজ 'শহীদ রুদাকি'। ইরানের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি বিশাল আকৃতির এই জাহাজকে হঠাৎ দেখলে মনে হয় সাগরে ভাসমান এক ছোট্ট শহর। জাহাজটির ভিডিও প্রকাশ করেছে আইআরজিসি।

ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দর আব্বাসে বিশাল এই যুদ্ধজাহাজ সংযোজনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইআরজিসি'র প্রধান মেজর জেনারেল হোসেইন সালামিসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।

বিশাল এই যুদ্ধজাহাজ বিভিন্ন ধরনের হেলিকপ্টার, ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র, রাডার এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বহন করতে সক্ষম। এতে রয়েছে থ্রিডি রাডার, জাহাজ থেকে জাহাজে এবং আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র। এছাড়া রয়েছে অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা।

এই যুদ্ধজাহাজ দূরবর্তী মহাসাগরে গিয়েও অভিযান চালাতে সক্ষম। বিশাল আকারের হওয়ার কারণে ইরানের এই জাহাজকে সাগরে ভাসমান শহর হিসেবেও অভিহিত করা হচ্ছে।

এই যুদ্ধজাহাজ সাগরে ইরানসহ বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক জাহাজকে নিরাপত্তা দেওয়ার পাশাপাশি মানবিক সহযোগিতা দেওয়ার কাজও করবে। ইরানের রয়েছে বিশাল পানিসীমা। এ কারণে দেশটি ইসলামি বিপ্লবের পর থেকেই সামরিক বাহিনীর অন্যান্য ইউনিটের পাশাপাশি নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার কাজে মনোনিবেশ করেছে।

মালবাহী ওয়াগন নির্মাণে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর ইরান

মালবাহী ওয়াগন উৎপাদনে সম্পূর্ণ স্বনির্ভরশীলতা অর্জন করেছে ইরানের রেলওয়ে শিল্প। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রেলওয়ে (যা আরএআই নামে পরিচিত) প্রধান সাইদ রাসুলি এই তথ্য জানান।

গত ৮ ডিসেম্বর ২০২০ দেশীয়ভাবে তৈরি ওয়াগন ব্রেক সিস্টেম এবং রেল চাকার উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আরএআই মালবাহী ওয়াগনের জন্য ৫০০টি মনোব্লক চাকা ও ৫০০টি ব্রেক সিস্টেম ক্রয়ের জন্য দেশীয় উৎপাদনকারীদের সাথে একটি চুক্তি সই করতে যাচ্ছে।

ইরানি এই কর্মকর্তা বলেন, এবছর প্রথমবারের মতো দেশীয়ভাবে তৈরি চাকা জাতীয় রেলে যুক্ত হচ্ছে।

আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই কেবল ইরান থেকে অস্ত্র ক্রয় করা যাবে : আলী রাবিয়ি

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান বলেছে, যেসব দেশ ইরান থেকে অস্ত্র কিনতে চায় তারা শুধু আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই তা কিনতে পারবে। কোনো দেশ যুদ্ধকামী নীতি থেকে ইরানি অস্ত্র কিনতে পারবে না।

ইরান সরকারের মুখপাত্র আলী রাবিয়ি গত ২৩ অক্টোবর ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আইআরবি-কে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, যেসব দেশ ইরান থেকে অস্ত্র কিনতে চায় তাদেরকে ইরানের শর্ত মেনেই তা করতে হবে, কোনো দেশ তাদের নিজেদের শর্ত ইরানের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবে না। অস্ত্র ক্রেতাদের দেশগুলোকে অবশ্যই অস্ত্র কেনার যৌক্তিক এবং নৈতিক অবস্থান তুলে ধরতে হবে, তারা কেউ যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে ইরানের অস্ত্র কিনতে পারবে না।

আলী রাবিয়ি সুস্পষ্টভাবে বলেন, আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতি এবং কাঠামোর ভেতরে থেকেই ইরান অস্ত্র বিক্রি করবে। তিনি বলেন, 'আমরা প্রকৃতপক্ষে অস্ত্রের ভক্ত নই, আমরা শান্তি চাই এবং মধ্যপ্রাচ্যকে অস্ত্র-গুদামে পরিণত করতে চাই না।'

ইরান সরকারের মুখপাত্র আরো বলেন, আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যকে অস্ত্রের গুদামে পরিণত করেছে এবং এর মাধ্যমে মূলত মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীরা লাভবান হচ্ছেন। তাঁদের কাছে সবসময় মানুষের জীবনের চেয়ে অর্থগত লাভটাই বেশি পছন্দের।

ইরানে বিশালায়তনের ভূগর্ভস্থ শহরের সন্ধান

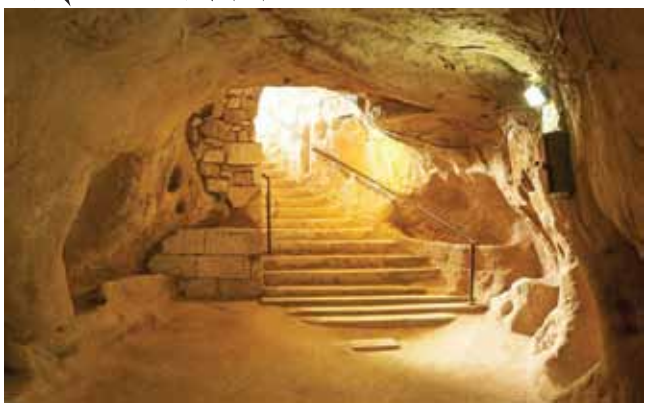

মধ্য ইরানের তাফতেশে বিশালায়তনের একটি ভূগর্ভস্থ শহরের সন্ধান পাওয়া গেছে। দেশটির প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলছেন, সম্প্রতি তাঁরা যে একটি প্রবেশপথ আবিষ্কার করেছেন সেটি বিশাল একটি ভূগর্ভস্থ শহরের প্রবেশদ্বার হতে পারে। গত ৮ ডিসেম্বর তাফরেশের গভর্নর আব্দোলরেজা হাজালিবেইগি এই তথ্য জানান।

ওই কর্মকর্তা জানান, সম্প্রতি এক সপ্তাহে খনন কাজ পরিচালনা করা হয়। এসময় তাফরেশের ভূগর্ভস্থ ওই শহরটির প্রধান এলাকায় প্রবেশের প্রথম চিহ্ন প্রকাশিত হয়। হাতে খোদাই করা ভূগর্ভস্থ শহরটি তাফরেশ আধুনিক শহরের নিম্নদেশে অবস্থিত। যার আয়তন তিন হেক্টর। ইরান এমনকি পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম ভূগর্ভস্থ এলাকা এটি।

গভর্নর আরও জানান, ভূগর্ভস্থ শহরটিতে প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো হয় গত গ্রীষ্মকালে এবং বর্তমানে স্থানটিতে দ্বিতীয় পর্বের অনুসন্ধান চলছে।

ইরানে প্রথম পর্যটন ফার্মের উদ্বোধন

ইরানে পাঁচ হেক্টর জায়গার ওপর দেশটির প্রথম পর্যটন ফার্ম চালু করা হয়েছে। উত্তরাঞ্চলীয় গোলেস্তান প্রদেশে ঘনবন সংলগ্ন একটি প্রাকৃতিক উর্বর জমিতে ফার্মটি তৈরি করা হয়েছে।

গত ৯ নভেম্বর ২০২০ প্রাদেশিক পর্যটন বিভাগের উপপ্রধান বলেন, গোলেস্তান প্রদেশে পর্যটন উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষি পর্যটন অন্যতম অবহেলিত দিক। অথচ এই পর্যটনের ৯২টি কৃষি পণ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে এবং গোলেস্তান কাসপিয়ান সাগরের নিকটে একটি অনুকূল আবহাওয়া ও উর্বর জমিসমৃদ্ধ এলাকা।

এই কর্মকর্তা আরও জানান, গত মাসে (২০ সেপ্টেম্বর থেকে ২১ অক্টোবর) তাসকেস্তানে পর্যটন ফার্মটি উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রদেশ জুড়ে কৃষি পর্যটনে বিনিয়োগের নতুন অধ্যায় উন্মুক্ত করবে এই ফার্মটি।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে ইরানের রপ্তানি বেড়েছে ১৩ শতাংশ

চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে (জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর) ইউরোপীয় ইউনিয়নে ইরানের তেল-বহির্ভূত রপ্তানি বেড়েছে ১৩ শতাংশ।

২০২০ সালের প্রথম নয় মাসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে ইরানের বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ দশমিক ৩৪৫ বিলিয়ন ইউরো। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় এই বাণিজ্যর পরিমাণ ১১ শতাংশ কম। তবে একই সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নে ইরানের তেল-বহির্ভূত পণ্য সামগ্রীর রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩ শতাংশ।

বিশ্বসেরা গবেষকদের তালিকায় ১২ ইরানি অধ্যাপক

বিশ্বে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গবেষকদের তালিকায় স্থান পেয়েছেন ইরানের ১২ জন অধ্যাপক। ক্লারিভেট (ডাব্লিউওএস) প্রকাশিত 'হাইলি সাইটেড রিসার্চার্স ২০২০'-এর সদ্য-উন্মোচিত তালিকায় এই চিত্র উঠে এসেছে।

মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞান সাইটেশন ডাটাবেজ আইএসসি এর প্রধান মোহাম্মাদ জাভাদ দেহকানি জানান, ক্লারিভেট অ্যানালিটিকসে (আইএসআই) প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী যেসব গবেষকের নিবন্ধ সর্বাধিক উদ্ধৃত হয়েছে তাদেরকে পরিচয় করানো হয়।

২০২০ সালের শীর্ষ গবেষক হিসেবে প্রায় ৬ হাজার ৩৮৯ জন গবেষককে বাছাই করা হয়। ২০২০ সালে বিশ্বের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গবেষকদের এই তালিকায় ইরানের ১২ গবেষক স্থান পেয়েছেন বলে জানান দেহকানি।

বিজ্ঞান গবেষণায় ৫ম স্থানে ইরান

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে ৫ম স্থানে রয়েছে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান। এছাড়া, বৈজ্ঞানিক উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেশটি বর্তমানে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর ইরানের বিজ্ঞান, গবেষণা ও প্রযুক্তিমন্ত্রী মানসুর গোলামি এ তথ্য জানান।

নির্বাচিত কয়েকজন বিজ্ঞান গবেষক ও প্রযুক্তিবিদকে দেয়া সম্মাননা অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ইরানের অবস্থানেরও প্রশংসা করেন মন্ত্রী।

মানসুর গোলামি বলেন, বিশ্বে যেসব দেশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহু বছর ধরে নেতৃত্ব দিচ্ছে ইরান তাদের মধ্যে রয়েছে। তবে এই অবস্থান ধরে রাখতে হলে বিজ্ঞান, গবেষণা ও প্রযুক্তি খাতকে সর্বাত্মক সমর্থন দিতে হবে।

ইরানের এ মন্ত্রী বলেন, 'আজকে দেশে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পার্ক গড়ে উঠেছে তা এখন গর্ব ও আশার উৎস। এই পার্ক দেশের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখন আমরা গর্বের সঙ্গে দাবি করতে পারি যে, জ্ঞানের ধারা তৈরি, সেগুলোকে প্রযুক্তি খাতে ব্যবহার ও সম্পদ অর্জনের জন্য বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছি আমরা।'

কমসটেক অ্যাওয়ার্ড পেলেন ইরানি অধ্যাপক জাফরি

গণিতে মুসলিম দেশগুলোর সংগঠন ওআইসির অঙ্গপ্রতিষ্ঠান কমসটেক অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ লাভ করলেন ইরানি অধ্যাপক। ইরানের আমিরকবির ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির অনুষদ সদস্য সাজ্জাদ জাফরি এই পুরস্কার লাভ করেন।

কমসটেক ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা ওআইসির বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বিষয়ক কার্যনির্বাহী স্থায়ী কমিটি। ইরানি অধ্যাপক পুরস্কার হিসেবে ৫ হাজার মার্কিন ডলার লাভ করেন।

জাফরি ১৯৮৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আমিরকবির ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পড়াশোনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ২০০৫ সালে বিএসসি, ২০০৮ সালে এমএসসি ও ২০১৩ সালে পিএইচডি করেন। ২০১৩ সাল থেকে তিনি এখানে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াডে ইরানি শিক্ষার্থীদের ৮ মেডেল

ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াড অন অ্যাস্ট্রোনমি এবং অ্যাস্ট্রোফিজিক্স (আইওএএ) এ আটটি রঙিন মেডেল জিতেছে ইরানি শিক্ষার্থীরা।

ন্যাশনাল অরগানাইজেশন ফর ডেভেলপমেন্ট অব এক্সসেপশনাল ট্যালেন্টস গত ৪ নভেম্বর এই তথ্য জানায়।

আইওএএ এর এবারের পর্বের আয়োজন করে স্লোভাকিয়া। করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে এবছর ভারচুয়ালি এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ইরানি শিক্ষার্থীরা দুটি স্বর্ণ, দুটি রৌপ্য ও চারটি ব্রোঞ্জপদক লাভ করে। এছাড়া দুটি সম্মানজনক ডিপ্লোমা লাভ করে দেশটির শিক্ষার্থীরা। এ নিয়ে বিশ্বে পঞ্চম অবস্থান দখল করে তারা।

স্বর্ণজয়ী ইরানি দুই শিক্ষার্থী হলো কাসরা হাজিয়ান ও পারশান জাভানরুদ। রুপা জিতেছে আলি রাজ কান্দি ও মতিন মোহাম্মাদি সারাই। আর ব্রোঞ্জপদক লাভ করে আমির হোসাইন হাজী মোহাম্মদ রেজায়ে, ফাতেমেহ আলী মুরাদী, হোসেইন মোহাম্মদী, এবং মোহাম্মদ মেহেদী ওয়াহেদী।

ইরানের তৈরি হলো সেরা ইসলামি কম্পিউটার গেম

‘অ্যাম্বাসেডর অব লাভ’ তথা ভালোবাসার দূত নামে একটি অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার গেম তৈরি করল ইরানের ইসলামিক রেভ্যুলুশন সেন্টার ফর ডিজিটাল প্রোডাক্ট অ্যান্ড পাবলিকেশন মাটনা। গেমটির প্রযোজকরা এটিকে সবচেয়ে বড় ইরানি-ইসলামি কম্পিউটার গেম প্রকল্প হিসেবে অভিহিত করেছেন।

গত ১৫ ডিসেম্বর মাটনা প্রকাশিত একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মেহদি জাফরি জোজানি বলেন, গেমারদের চাহিদা পূরণ করতে দেশের তরুণ দক্ষ গেম নির্মাতারা বৃহত্তম এই ইরানি-ইসলামি কম্পিউটার গেম প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করেছে।

থার্ড পারসন অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার গেম ‘অ্যাম্বাসেডর অব লাভ’ শুরু হয়েছে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর দূত মুসলিম ইবনে আকিল আল হাশিমির (আ.) কুফায় আগমন দিয়ে। আশুরা বিদ্রোহের কয়েক দিন আগে তিনি কুফায় আগমন করেন। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দের এই ঘটনায় ইমাম ও তাঁর সঙ্গী-সাথিরা শাহাদাত বরণ করেন।

অস্কারে ইরানের প্রতিনিধিত্ব করবে মাজিদির ‘দ্যা সান’

২০২১ অস্কার অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে সেরা আন্তর্জাতিক বিদেশি ভাষার ছবি হিসেবে ইরানের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার মজিদ মাজিদির ‘দ্যা সান’। অস্কারের জন্য ইরানের সিনেমা বাছাই কমিটির মুখপাত্র রাইদ ফরিদজাদেহ এই ঘোষণা দিয়েছেন।

তিনি জানান, এবছর অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের জন্য প্রাথমিকভাবে ১২টি ছবির সংক্ষিপ্ত তালিকা করা হয়। এসব চলচ্চিত্রের মধ্য থেকে বাছাই কমিটি ‘দ্যা সান’কে এ বছর ইরান থেকে অস্কারে পাঠানোর জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত করেন।

‘দ্যা সান’ ছবিটিতে ১২ বছর বয়সী বারক আলি ও তার তিন বন্ধুর গল্প তুলে ধরা হয়েছে। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে ও পরিবারের সহায়তায় তারা একত্রে কঠোর পরিশ্রম করে। তারা একটি গ্যারেজে ছোটখাটো কাজ নেয়। দ্রুত টাকা আয় করতে গিয়ে তারা ছোট অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

এর আগে ৭৭তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিয়ে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার মজিদ মাজিদির ছবিটি অ্যাওয়ার্ড জিতে।

তিন আন্তর্জাতিক উৎসবে পুরস্কার জিতলো ইরানি ছবি ‘উইকেন্ড’

তিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার জিতলো ইরানি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি ‘উইকেন্ড’। চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন চলচ্চিত্রকার আরিয়ো

মোতেভাকেহ। 'উইকেন্ড' আমেরিকার ৫১তম নাশভিল্লে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, ১৭তম সেডিকিকোরতোত উৎসবের ইরানি চলচ্চিত্র বিভাগ ও ট্রিয়ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিভাগে দেখানো হয়।

স্বল্পদৈর্ঘ্যটি নাশভিল্লে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গ্রেভইয়ার্ড শিফট অ্যাওয়ার্ড এবং সেডিকিকোরটোট ও ট্রিয়নে আর্টিস্টিক ইভেন্টে সেরা ফিকশন স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা অ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

এছাড়া আর্মেনিয়ায় ওয়ান শট এর আন্তর্জাতিক উৎসবে বিশেষ অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে চলচ্চিত্রটি।

তেহরান অ্যানিমেশন উৎসবে ৮৫ দেশের সহস্রাধিক ছবি

দ্বাদশ তেহরান আন্তর্জাতিক অ্যানিমেশন উৎসবের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগে দেখানো হবে ৮৫টি দেশের সহস্রাধিক ছবি। বেশিরভাগ অ্যানিমেশন জমা পড়েছে জাপান, চীন, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, নরওয়ে, সুইডেন, ইতালি ও ব্রাজিল থেকে। আর বাকি দেশগুলো থেকে কয়েক ডজন ছবি দেখানো হবে।

উৎসবের জাতীয় বিভাগে প্রায় ৪৬০টি ইরানি অ্যানিমেশন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। উৎসবের এবারের দ্বাদশ আসর আগামী বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে চলবে ৪ মার্চ পর্যন্ত।

তেহরান আন্তর্জাতিক অ্যানিমেশন উৎসবের আয়োজক শিশু ও তরুণদের মেধা বিকাশ বিষয়ক ইন্সটিটিউট আইআইডিসিওয়াইএ।

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আসছে ৩৫টি ইরানি ছবি

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২০ এ দেখানো হবে ৩৫টি ইরানি ছবি। আসছে বছরের জানুয়ারিতে উৎসবের ১৯তম আসর বসবে। ঢাকা উৎসবের বিভিন্ন বিভাগে ছবিগুলো দেখানো হবে।

এশিয়ান ফিল্ম প্রতিযোগিতা বিভাগে ইরানি চলচ্চিত্রকার আব্বাস আমিনির 'দ্যা স্লটার হাউজ', শাহরাম মোকরির 'কেয়ারলেস ক্রাইম' ও সাফি ইয়াজদানিয়ানের 'সাডেনলি এ ট্রি' দেখানো হবে।

সিনেমা অব দ্য ওয়ার্ল্ড এ দেখানো হবে মাহমুদ রেজা সানির 'কিয়ারোস্তামি অ্যান্ড হিজ মিসিং কেইন', কেইভান আলি মোহাম্মাদির সিনেমা 'শাহর-ই কেসসেহ', কারিম মোহাম্মাদ আমিনির 'দ্যা ব্ল্যাক ক্যাট', বোরজু নিকনেজাদের 'অ্যাফিবিয়াস' ও কাজেম মোল্লায়ির 'দ্যা বাদগার'। এছাড়াও এই বিভাগে ইরান ও জাপানের যৌথ প্রযোজনার ছবি 'হোটেল নিউ মুন' দেখানো হবে।

উইমেন্স ফিল্ম মেকার বিভাগে দেখানো হবে ফেরেসতেহ তাভাক্কোলির 'সিকিং লস্ট', শাকিবা খালেকির 'টিরিশকো', মাসুমেহ নূরমোহাম্মাদি কোমির 'ফুকুশিমা ট্রাভেলর', আজাদেহ মুসাভির 'দ্যা ভিজিট', নিলুফার জামানের 'দ্যা ডার্ক ডেজ', মানিজেহ হেকমাতের 'বন্দর ব্যান্ড' ও হান্না জালালির 'ইন্টারভিউ'।

স্পিরিচুয়াল বিভাগে দেখানো হবো আব্বাস আমিনির 'আই অ্যাম হেয়ার', হামেদ তেহরানির 'ডায়াপ্যাসন', সাইয়িদ নেজাতির 'ডাবুর', আবোদ কাজেমির 'আরসু' ও মেহরদাদ ওসকুয়ির 'সানলেস শ্যাডোস'।

চিলড্রেন ফিল্মস বিভাগে দেখানো হবে কেইভান মাজিদির 'দ্যা ব্লু গার্ল', হামিদ রেজা কোতবির 'দ্যাট নাইটস ট্রেইন', মোজগান বায়াতের 'বর্ন অব দ্যা আর্থ', তেইমুর কাদেরির গান্দো' ও বাবাক নাবিজাদেহর 'দ্যা ওসান বিহাইন্ড দ্যা উইন্ডো'। এছাড়া শর্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেনডেন্ট ফিল্ম বিভাগে দেখানো হবে আলি আসগারির 'উইটনেস', হুমান ফাখতেহর 'টেল অব ইবি', মেহরান হেম্মাতজাদেহর 'দ্যা ড্রিমার' ও মাহশাদ ভালির 'আই'।

মিউনিখে ইরানি আলোকচিত্রীর প্রথম পুরস্কার জয়

কোভিড-১৯ মহামারিকালীন সাংস্কৃতিক শাটডাউনের ওপর আয়োজিত ফটো প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে ইরানি আলোকচিত্রী আলি হাদ্দাদি ও জোহরেহ সালিমি। তাঁদের সংগৃহীত ১২টি ফটো প্রতিযোগিতায় শীর্ষ স্থান দখল করে।

এই আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জার্মানির বাভারিয়ার মিউনিখের সাবেক ফ্যাক্টরি প্যাসিঞ্জার ফ্যাবরিক।

স্থানটি এখন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও ইভেন্ট ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য জমা পড়া ছবিগুলো থেকে বাছাইকৃত সব ফটো ২৩ অক্টোবর থেকে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটিতে প্রদর্শন শুরু হয়। প্রদর্শনী চলে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত।

ফটো প্রদর্শনীর কিউরেটর হচ্ছেন থোমাস লিনসমায়ার ও স্টেফ্যান-মারিয়া মিটেনডোরফ।

শিশু-কিশোরদের জন্য

মহান আল্লাহর পরিচয়

গোলাম রেযা হায়দারী আবহুরী
অনুবাদ : আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

জাহান্নাম সৃষ্টির উদ্দেশ্য

‘আল্লাহ তোমাদেরকে বেহেশতের দিকে আহ্বান জানান।’– সূরা বাকারাহ্, আয়াত নং ২২১

আল্লাহ মানুষদের পোড়ানোর জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন কেন?

আল্লাহ কাউকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে একদম পছন্দ করেন না। তিনি আমাদের মানুষদের বুদ্ধি দিয়েছেন যাতে আমরা খারাপ পথ বাদ দিয়ে ভালো পথে চলি এবং পথভ্রষ্ট হয়ে জাহান্নামে না যাই। আল্লাহ অসংখ্য নবীও পাঠিয়েছেন যাতে তাঁরা মানুষদেরকে পথ দেখাতে পারেন এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে ভয় প্রদর্শন করেন।

আল্লাহ যে কোনো পাপী লোককেই জাহান্নামে নিয়ে যাবেন না। যারা তাদের পাপ কাজের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং তওবা করবে, তারা জাহান্নামে যাবে না। তা ছাড়া আল্লাহ আমাদের অনেক পাপকে তওবা ছাড়াই ক্ষমা করে দেবেন।

আল্লাহর করুণা অনেক বেশি। শুধু তারাই জাহান্নামে যাবে, যারা আল্লাহর কথা মেনে চলেনি এবং পাপ কাজ করার পরে তওবা করার পরিবর্তে আরো পাপ কাজে লিপ্ত হয়েছে।

ইয়াযীদ, যে ইমাম হোসাইন (আ.)-এর পিপাসার্ত গলা কেটেছে, তাঁর শিশু-সন্তানদের চাবুক মেরে জখম করে দিয়েছে এবং তাঁদেরকে মরুভুমির মধ্যে ভিটামাটি ছাড়া করেছে, তার কি জাহান্নামে যাওয়া উচিত নয়? কিংবা যে ব্যক্তি হাজার হাজার নিরপরাধ নারী ও পুরুষ হত্যা করেছে এবং অসহায় শিশুদেরকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে হত্যা করেছে, তার কি জাহান্নামে যাওয়া উচিত নয়? এ ধরনের লোকেরা তো নিজেরাই জাহান্নামকে বেছে নিয়েছে।

আল্লাহ মানুষদের জন্য যে জায়গা নির্বাচন করেছেন সেটা হলো বেহেশত। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত বেহেশত সম্পর্কে কথা বলে, সেটা এ কারণে যে, আমরা যেন ভালো কাজ করার মাধ্যমে বেহেশতে যেতে পারি। সূরা বাকারার ২২১ নং আয়াতে আমরা পড়ি : ‘আল্লাহ তোমাদেরকে বেহেশতের দিকে আহ্বান করেন।’ আর সূরা আলে ইমরান-এ আল্লাহ বলেন : ‘তোমরা ধাবিত হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই বেহেশতের দিকে, যার আয়তন হবে আসমান ও জমিনের আয়তনের সমান, যা পরহেজগার লোকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।’

যখন পবিত্র কোরআন জাহান্নাম সম্পর্কে বর্ণনা দেয় তখন আমাদেরকে জাহান্নামের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে চায়। যদি আল্লাহ মানুষদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে চাইতেন তা হলে বেহেশত তৈরি করার কোনো যুক্তি থাকত না; কিংবা মানুষদের জাহান্নাম থেকে সতর্ক করার কোনো কারণ থাকত না।

জাহান্নাম হলো কাফের ও পাপিষ্ঠ লোকদের কর্মফল। যেমনভাবে যে ব্যক্তি দাঁত ব্রাশ করে না, তার দাঁত যেমন নষ্ট হয়ে যায় এবং যন্ত্রণা করে কিংবা যে ব্যক্তি পেট ভরে খায় সে যেমন অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা যে ব্যক্তি শীতের মধ্যে পাতলা কাপড় গায়ে দিয়ে বাইরে বের হয় তার যেমন সর্দি লাগে, ঠিক একই ভাবে যে ব্যক্তি গোনাহ করতে থাকে তার পরিণতি হয় জাহান্নাম।

আমরা বেহেশতি হই আল্লাহ সেটাই পছন্দ করেন। আর আমাদের বেহেশতে পৌঁছানোর জন্য তিনি অনেক সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু কেউ যদি জাহান্নামের পথকেই বেছে নিতে চায়, তা হলে সেটা তার নিজের দোষ।

আশা পূরণের গাছ : পূজা রহস্য

মাহদী অযার ইয়াযদী
অনুবাদ : মোঃ কামাল হোসাইন

সে অনেক দিন আগের কথা। চীনের একটি শহরে অতীত কালে একটি গাছ ছিলো। ঐ গাছটিকে 'পূজনীয় গাছ' বা 'উদ্দেশ্য পূরণের গাছ' হিসেবে অভিহিত করা হতো। ঐ গাছটি ছিলো প্রকাণ্ড। অনেক উঁচু, প্রচুর ডালপালা সব সময় পত্র-পল্লবে সবুজ থাকতো। এটা আয়তনে এত মোটা ছিলো যে, ছয়জন মানুষ হাতে হাত ধরে চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়ালে তবে প্রথম ব্যক্তির হাত ষষ্ঠ ব্যক্তি ধরতে পারতো।

শহরের লোকেরা ছিলো মূর্তিপূজারি। ঐ গাছটিকে তারা দেবতার মতো পূজা করতো। প্রতি সপ্তাহে একদিন সবাই সেখানে জড়ো হতো, মন্ত্রাদি পাঠ করতো, যাদের কোনো সমস্যা থাকতো তারা ওখানে মানত করতো। টাকা-পয়সা, সোনাদানা, হীরা, জহরত ঐ মোটা গাছে একটি ছিদ্রে দান করতো এবং তারা বিশ্বাস করতো ঐ গাছ তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে এবং তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

একদিন পৃথিবী ভ্রমণকারী একজন পর্যটক ঐ শহরে গিয়ে পৌঁছলো এবং দেখতে পেলো সব ঘর বন্ধ, সব গলি জনশূন্য এবং প্রচুর লোক একটি দরজা দিয়ে বের হচ্ছে। পর্যটক একজনকে জিজ্ঞেস করলেন : 'আজকে এমন কী আছে যে সবাই শহর জনশূন্য করে মরুভূমির দিকে যাচ্ছে?' সে জবাব দিলো : 'এটা তো কোনো নতুন খবর নয়। আজকে তো উদ্দেশ্য পূরণের গাছ উৎসবের দিন। লোকেরা তাদের উদ্দেশ্য পূরণের দিকে যাচ্ছে। আপনি উদ্দেশ্য পূরণের গাছটি চেনেন না?'

পর্যটক বললেন : 'না, আমি মুসাফির মানুষ। এখানে আমি অপরিচিত, এই মাত্রই এই শহরে প্রবেশ করেছি। আমি কখনো উদ্দেশ্য পূরণের গাছ দেখিনি।'

তারা বললো : 'বেশ তো। নতুন এসেছেন, আপনাকে স্বাগতম। আপনিও আমাদের সাথে আসুন। যদি আপনার কোনো ইচ্ছা থাকে তা হলে ঐ গাছের কাছে গিয়ে বলবেন।'

পর্যটক একদল লোকের সাথে পথ চলতে আরম্ভ করলেন। শহরের দরজার বাইরে এসে দেখলেন বিশাল এক মাঠে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ এবং এই পুরোনো বৃক্ষের অদূরেই অনেক বাড়িঘর রয়েছে। প্রচুর লোক, ছোট বড় সবাই এই মাঠে সমবেত হয়ে শোরগোল করছে। দলে দলে লোক বিভিন্ন মন্ত্র পড়ছে, বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করছে। কেউ গাছে চুমু দিচ্ছে, পূজা করছে এবং ঐ বৃক্ষের কাছে নিজের মনোবাসনা পূর্ণতার জন্য প্রার্থনা করছে।

পর্যটক এ অবস্থা অবলোকন করে খুবই অবাক হলেন এবং একজন বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন : 'আপনারা এ কেমন ধর্ম পালন করছেন?'

বৃদ্ধ লোকটি রাগান্বিত দৃষ্টিতে পর্যটকের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো : 'আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা উদ্দেশ্য পূরণের গাছের পূজা করছি? আপনি কি ধর্মে বিশ্বাস করেন না যে, এ ধরনের কথা বলছেন?'

পর্যটক বললেন : 'কেন নয়? আমার ধর্মবিশ্বাস আছে কিন্তু আমি এখানে ভিনদেশী পর্যটক। আমি আপনাদের শহরের বা আপনাদের ধর্মের নই। যদি সম্ভব হয় আমাকে আপনাদের ধর্মীয় নেতার কাছে নিয়ে চলুন; তা হলে তাঁর কাছে প্রশ্ন করে কিছু বিষয় জানতে ও বুঝতে পারব।'

বৃদ্ধ লোকটি বললো : 'চলুন আপনাকে আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্মগুরুর কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তিনি আপনাকে সবকিছু বলতে পারবেন।' পর্যটককে লোকটি ময়দানের কোনায় একটি তাঁবুর কাছে নিয়ে গেলেন এবং শহরের সবচেয়ে বড় ধর্মগুরুর কাছে নিয়ে গিয়ে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। পর্যটক যথাযথ সম্মান রক্ষা করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন : 'আমি এখানে একজন ভিনদেশী পর্যটক। আমি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে বেড়াই। দুনিয়ার অনেক দেশ ঘুরে বেড়িয়েছি। অনেক দেশের মানুষের সাথে পরিচয় ঘটেছে। কতিপয় ধর্মীয় নেতা-পীরদের সাথে কথোপকথন করেছি। কিন্তু আপনার শহরের মতো এমন আজব জিনিস এবং এ রকম উদ্দেশ্য পূরণের গাছ কোথাও দেখিনি। এ বিষয়ে আমি আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন করতে চাই এবং আপনাদের পথ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে চাই।'

বরফের মতো সাদা ধবধবে চুলওয়ালা বয়োবৃদ্ধ গুরু খুবই মিষ্টভাষী ছিলেন। তিনি জবাব দিলেন : 'আপনাকে দেখে আমি খুশি হয়েছি এবং আপনাকে সব রকম বিষয়ে সহয়তা করতে প্রস্তুত। আপনি যা জানতে চান বলুন।' পর্যটক লোকটি বললেন : 'আমি জানতে চাই আপনারা এই গাছটির পূজা করছেন কেন?'

বৃদ্ধ ধর্মগুরু জবাব দিলেন : 'আমরা এর পূজা করি এ জন্য যে, এ গাছটির কাছে মানুষ অনেক কিছু প্রত্যাশা করে আর এটি অনেক সম্মানিত ও পবিত্র গাছ। তাই আমরা এর পূজা করি।'

পর্যটক ভয় পেলেন যে, যদি তাদের ধর্মবিশ্বাসের বিপরীত মত পোষণ করেন তা হলে তারা তাঁকে কষ্ট দিতে পারে। তাই বললেন : 'আপনি জানেন যে, আপনার সাথে আমার কোনো শত্রুতা নেই। আপনার সাথে আপনাদের সংস্কৃতি নিয়ে এজন্য কথা বলতে চাই যাতে এ বিষয়ে আরো অধিক জানতে পারি। কিন্তু আমার খুব অবাক লাগলো, আপনারা সবকিছু ছেড়ে একটা গাছের উপাসনা করছেন! প্রকৃতপক্ষে গাছের নিজের তো কোন ইচ্ছা বা এখতিয়ার নেই। কথা বলতে পারে না, কোনো কিছু বোঝে না, কোনো কাজ সে সম্পন্ন করতে পারে না, সে নিজেই তো অক্ষম। যদি কেউ চায় যে, ওটাকে কেটে ফেলবে বা পুড়িয়ে দেবে তা হলে তো সে নিজেকেই রক্ষা করতে পারবে না। কিভাবে এর কাছে আপনারা আপনাদের প্রয়োজন পূরণের নিবেদন করেন এবং অপেক্ষা করেন যে, গাছ আপনাদের কাজ করে দেবে?'

বৃদ্ধ ধর্মগুরু জবাব দিলেন : 'এমন অনেক কিছু আছে, যা আমরা জানি না। যদি আপনার এত সন্দেহ হয়, যদি এ গাছের উপর আপনার কোনো বিশ্বাস না থাকে, তবে কেউ তো চন্দ্র, সূর্য বা অন্যান্য জিনিসের উপাসনা করে, তারাও তো আপনাকে কোনো জবাব দিতে পারবে না। আর তাছাড়া এ গাছ আমরা তৈরি করিনি। এ গাছ অনন্ত কাল ধরে আছে আর আমাদের বাপ-দাদারা ওটাকে পূজা করেছে। তাই আমরাও পূজা করি। তা ছাড়া এ গাছের ইচ্ছা অনিচ্ছা আছে, কথা বলে এবং অনেক বড় বড় কাজ আঞ্জাম দেয়, যা অন্য কেউ করতে পারবে না। এ

গাছ মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে। আর দুনিয়াতে এমন কোনো গাছ নেই যে একাজ করতে পারে। আর কী চান?'

পর্যটক বললেন : 'ঐ কথা বলা গাছটি কি আমি দেখতে পারি?' বৃদ্ধ ধর্মগুরু বললেন : 'কেন নয়? এ বৃক্ষ মানুষকে পথনির্দেশ করে। আপনি যা চান তার সবকিছুর সে জবাব দেবে, কিন্তু শর্ত হলো তাকে সম্মান ও আদব প্রদর্শন করে কথা বলতে হবে এবং আমাদের সাথে যেতে হবে।'

পর্যটক বললেন : 'বেশ তো, চলুন তা হলে, গাছের সাথে কিছু কথাবার্তা বলা যাক।' বৃদ্ধ ধর্মগুরু পর্যটকের সাথে আসলেন, যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং গাছকে বললেন : 'হে পবিত্র বৃক্ষ! এই লোকটি একজন ভিনদেশী মুসাফির। তিনি আপনার সাথে কথা বলতে চান।'

গাছের ভেতর থেকে আওয়াজ আসলো : 'আমি ভিনদেশী লোকদের কদর করি। কিন্তু যদি সে বিশ্বাস স্থাপন না করে এবং আমাদের ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়, তা হলে তার সাথে কথা বলবো না। সে অপরিচিত লোক। প্রথমে তাকে আমাদের ধর্ম গ্রহণ করতে হবে।'

পর্যটক ধর্মগুরুকে বললেন : 'যথেষ্ট হয়েছে। চলুন ঘরে ফিরে যাই। কথা বলা গাছকে দেখলাম। এই দুনিয়ায় অনেক ধোঁকাবাজিও আমি দেখেছি। এত সহজে কোনো কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবো না। আমি এ গাছকে পরীক্ষা করবো। কিছু জ্বালানি তেল নিয়ে এসে গাছটিতে আগুন ধরিয়ে দেবো। যদি দেখি গাছ আগুনে না জ্বলে বা গাছে আগুন না লাগে তখন মেনে নেবো অথবা করাত এনে কাটার চেষ্টা করবো। যদি না কাটে তবে বিশ্বাস স্থাপন করবো।'

ধর্মগুরু বললেন : 'এমন পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। আপনি চুপ থাকুন। যদি লোকেরা বুঝতে পারে যে, আপনার মনে এমন বাজে ধারণা পোষণ করেন এবং আপনি উদ্দেশ্য পূরণের গাছকে অসম্মান করছেন, তা হলে আপনাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।' পর্যটক বললেন : 'ঠিক আছে, আমি বিশ্বাস স্থাপন করবো না। আর এ গাছের মাধ্যমে আপনাদের কল্যাণ হবে এমন কোনো বিশ্বাস আমি করি না। আপনাদের সাথে আমার কোনো শত্রুতা নেই। আপনাদের শহরে কয়েক দিন ঘুরে বেড়াবো। এরপর চলে যাবো।'

পর্যটক বুঝতে পেরেছিলেন যে, উদ্দেশ্য পূরণের গাছে একটা কিছু রহস্য আছে। এখানে একটা ধোঁকাবাজি চলছে, কিন্তু মানুষ ভয়ে কিছু বলতে পারছে না। ঐ দিন শহরের লোকেরা তাদের বাসগৃহে ফিরে গেলো। পর্যটক চিন্তা করলেন, এইতো মোক্ষম সুযোগ। রাতে যাবো ঐ বৃক্ষের কাছে। কুড়াল দিয়ে গাছটাকে কাটবো এবং এর রহস্য উদ্ঘাটন করবো। লোকেরা যে অজ্ঞতার ঘোরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে সেখান থেকে তাদেরকে মুক্ত করবো।

মধ্যরাতে যখন ঐ উদ্দেশ্য পূরণের গাছের কাছে ময়দানে কেউ নেই, তখন তিনি করাত ও কুঠার কাঁধে নিয়ে গাছের কাছে গেলেন এবং গাছ কাটতে উদ্যত হলেন। যখনই গাছে করাত লাগালেন, শব্দ শুনেই বুঝলেন যে, গাছের মধ্যে ফাঁপা জায়গা আছে। এরপর গাছ কাটা আরম্ভ করলেন। এমন সময় গাছের মধ্য থেকে উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ করে কেউ বললো : 'এই তুমি কে? কী চাও? করাত এনেছো কেন?'

পর্যটক বললেন : 'করাত তো কিছুই না। কুঠারও আছে। তোমাকে কাটতে চাই এবং এর মূলোৎপাটন করতে চাই।'

গাছের মধ্য থেকে বললো : 'আমার মধ্যে এমন কী খারাপ দেখলে যে, আমার সাথে শত্রুতা আরম্ভ করলে?'

পর্যটক বললেন : 'খারাপ কিছু করোনি। কিন্তু তুমি সাধারণ লোকদের ধোঁকা দিচ্ছো এবং খোদার স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে তুলছো। আর আমি জানি তোমার মধ্যে একটা রহস্য, একটা ধোঁকাবাজি আছে। আমি তোমাকে অপমানিত করতে চাই এবং মানুষকে ধোঁকা থেকে বিরত রাখতে চাই। কেননা, আমি জানি তোমার কোনো ক্ষমতা নেই। আর লোকেরা তোমাকে যে বিশ্বাস করে সেটা তাদের অজ্ঞতা এবং সত্য না জানার ফল।'

গাছ বললো : 'তুমি ভুল করছো। আমি মানুষের পূজনীয় গাছ। আর লোকেরা আমার দ্বারা উপকৃত হয়। আর এ জন্যই আমাকে বিশ্বাস করে। যদি তোমার কোনো প্রয়োজন থাকে তা হলে বলো আমি সমাধান করবো। যদি তুমি এখান থেকে চলে যাও আর আমাকে আমার মতো থাকতে দাও, তা হলে প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় এক পেয়ালা স্বর্ণ তোমাকে দেবো যাতে খুব দ্রুত তুমি পয়সাওয়ালা ও প্রতিপত্তিশালী হবে এবং আমাকে বড় জ্ঞান করবে। তুমি রাজি কিনা বলো?'

পর্যটক তাজ্জব বনে গেলেন। বললেন : 'তুমি কিভাবে টাকা-পয়সা, স্বর্ণ দেবে?'

গাছ বললো : 'প্রতিদিন সকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে শহরের দরজা থেকে বেরিয়ে এসে তোমার ডান পাশে একটি হ্রদ দেখতে পাবে। হ্রদের উপরে একটি ব্রীজ আছে। ব্রীজের দুপাশে ছোট দেয়াল আছে যাতে জানালা আছে। এর ডান পাশের প্রথম জানালার উপরে নিচে তাকাবে। এর চতুর্থ সেলফে এক বাটি স্বর্ণ দেখতে পাবে যা তুলে নিয়ে নিরাপদে বাড়ি যাবে। প্রতিদিন এভাবে করো, তা হলে দেখতে পাবে উদ্দেশ্য পূরণের গাছ কীভাবে তোমার উদ্দেশ্য পূরণ করে। যাতে তোমার শত্রুরাও তোমাকে সমীহ করবে।'

পর্যটক বিস্মিত হলেন। তিনি তাঁর কুঠার ও করাত নিয়ে চলে গেলেন। পরের দিন নির্দেশিত পথে গিয়ে এক বাটি স্বর্ণ দেখতে পেয়ে নিয়ে আসলেন এবং নিজে নিজে বললেন– উদ্দেশ্য পূরণের গাছ সবার জন্য খারাপ হলেও আমার উদ্দেশ্য পূরণ করছে। দেখা যাক কী হয়?

পরের দিনও একইভাবে স্বর্ণ পেলেন এবং চিন্তা করলেন– এটা তো খারাপ না। আমার অর্থ উপার্জন হচ্ছে। শহরের লোকেরা তাদের মতো করে চিন্তা করে। যে যার মতো ধর্ম পালন করে। যতদূর মনে হয়, লোকেরা খারাপ না। তারা তো কাউকে কষ্ট দেয় না। উদ্দেশ্য পূরণের গাছ আমার তো কোনো ক্ষতি করছে না।

ছয় দিন কেটে গেল। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে পর্যটক দেয়ালের চতুর্থ সেলফ থেকে বিনা পরিশ্রমে এক বাটি করে স্বর্ণ নিয়ে আসেন। এরপর প্রকৃতি দর্শনে বের হন। কিন্তু সপ্তম দিন কোনো স্বর্ণ পেলেন না। ছিদ্র দিয়ে ভালোভাবে দেখলেন, সব জায়গায় খুঁজলেন– তৃতীয় সেলফ থেকে পঞ্চম সেলফ, কিন্তু কোথাও নেই!

তখন তিনি বিষণ্ন হয়ে বললেন– এ পর্যন্ত উদ্দেশ্য পূরণের গাছ আমাকে স্বর্ণ দিয়েছে। আমিও কোনো কথা বলিনি। এখন বোঝা যাচ্ছে গাছ আমাকে ভুলে গেছে। আজ রাতে গিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবো।

মধ্যরাতে করাত ও কুঠার নিয়ে ময়দানের উদ্দেশ্য পূরণের গাছের দিকে রওয়ানা হলেন। যেতে যেতে গাছের নিকটে পৌছলেন।

যখনই ঐ চত্বরে প্রবেশ করলেন তখন অন্ধকারে দু'পাশ থেকে দু'ব্যক্তি চিৎকার করে বললো : 'এই ব্যাটা বদলোক! দাঁড়াও। একদম নড়বে না। যদি জায়গা থেকে এক পাও নড়ো, তবে একবারে শেষ করে ফেলবো।'

পর্যটক ভয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। দু'জন বিশালকায় লোক সামনে এসে বললো : 'তোমার মাথা ঠিক আছে তো। এই মধ্যরাতে

কোথায় যাচ্ছো?'

পর্যটক জানের ভয়ে বললেন : 'গাছের দর্শনে যাই।'

তারা বললো : 'এটা দর্শনের সময় না। এখন ঘুমের সময়। আর যদি দর্শনের জন্য যাবে, তা হলে তোমার কাছে করাত-কুঠার কেন? এ গাছের কাছে করাত-কুঠার নিয়ে আসা নিষেধ। ওগুলো এখানে রেখে তোমার মনোবাসনা বলে চলে যাও।'

পর্যটক নিরুপায় হয়ে করাত-কুঠার রেখে একাকী গাছের কাছে গিয়ে চিৎকার করে বললেন : 'হে উদ্দেশ্য পূরণের গাছ!' গাছ থেকে আওয়াজ আসলো : 'কী চাও?'

পর্যটক বললেন : 'আমি সেই ভিনদেশি লোক যাকে তুমি কথা দিয়েছিলে প্রতিদিন এক বাটি স্বর্ণ পাবো। কিন্তু পুলের জানালার কাছের চতুর্থ সেলফে কোনো স্বর্ণ ছিলো না।'

গাছ জবাব দিলো : 'হ্যাঁ, স্বর্ণ শেষ হয়ে গেছে। ওগুলো ভূতে নিয়ে গেছে। যদি টু শব্দ করো আর কাউকে এ বিষয়ে কিছু বলো তা হলে শহরের লোকদের বলে দেবো। তারা তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। তুমি একটা বেদ্বীন ও গোনাহগার যে আমাকে অসম্মান করেছ।'

পর্যটক বললেন : 'এটা কেমন কথা! এতদিন গোনাহগার ছিলাম না। আজ গোনাহগার হয়ে গেলাম?'

গাছ জবাব দিলো : 'এতদিন বিদেশি লোক ছিলে, মুসাফির ছিলে, মেহমান ছিলে। আমি চেয়েছিলাম তুমি এই শহরে নিরিবিলি থাকো। আমার কল্যাণকামী হয়ে চলে যাও। যেহেতু এখানে আসন গেড়ে বসেছো, তাই অবশ্যই তোমাকে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং অর্থ-সম্পদের লোভ করা যাবে না।'

পর্যটক বললেন : 'প্রথম দিন এ কথা বললেন না কেন? প্রথম রাতে যখন করাত-কুঠার নিয়ে এসেছিলাম সেদিনই জেনে যেতাম।'

গাছ বললো : 'প্রথম রাতে তোমার উদ্দেশ্য ভালো ছিলো এবং প্রভুর সন্ধানে এসেছিলে। আমিও তোমার বিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলাম। কেননা, প্রত্যেকের বিশ্বাসের মূল্য আছে। কিন্তু এখন স্বর্ণমুদ্রা বিক্রি করা তোমার ধর্মে পরিণত হয়েছে এবং এখানে টাকার জন্য এসেছো। তুমি একজন লোভী মানুষ। তাছাড়া ঐদিন অপরিচিত ছিলে। এখন শহরের লোকদেরকে তোমাকে চিনিয়ে দেবো। এটাও জেনে রাখো উদ্দেশ্য পূরণের গাছের শেকড় অনেক মজবুত, শক্তিশালী এবং বুদ্ধিদীপ্ত। এতদিন বন্ধুত্ব করে তোমাকে যেমন মুদ্রা দিয়েছে এখন শত্রুতা করে তোমার জানও নিতে পারে। শত্রুতা না চাইলে সুস্থ শরীরে চলে যাও। এখন সিদ্ধান্ত তোমার।'

পর্যটক বুঝলেন যে, এই গাছের কাছে জোর চলবে না। তাই কুঠার ও করাত নিয়ে সেখান থেকে ফিরে এলেন। করাত-কুঠার ঘরে রেখে পরের দিন শহর থেকে প্রস্থান করে অন্য শহরে পৌঁছলেন। সেখানকার লোকেরা খোদাভীরু। ঐ শহরের ধর্মগুরুকে দেখতে পেলেন– যাঁকে সবাই মুরশিদ বলে ডাকে। যদিও সে শহরে মূর্তিপূজারিও ছিলো। তাঁর সাথে কথাবার্তার এক পর্যায়ে বললেন : 'উদ্দেশ্য পূরণের গাছের বিষয়টা বুঝলাম না। সে কীভাবে কথা বলে আর সব মানুষকে আকৃষ্ট করে?'

মুরশিদ বললেন : 'ঐ গাছের রহস্য জানতে চাও? এটা তো খুব সহজ। ঐ গাছটি শত শত বছর থেকে অন্যান্য গাছের মতো সাধারণ গাছের মতোই ছিলো। যেটি অনেক পুরোনো ও বৃহৎ। যেহেতু গাছটি অনেক মোটা ছিলো আর শহরের প্রবেশ পথেই, শহরের পূর্বেকার প্রশাসক শহরের মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ তৈরি করেন এবং ঐ গাছের মধ্য পর্যন্ত তা বিস্তৃত করেন। ঐ গাছটিতে অন্যান্য অনেক পুরোনো গাছের মতো বড় ফাপা (শূন্যস্থান) ছিলো। প্রশাসকের একজন পাহারাদার সেখানে অবস্থান করতো। যুদ্ধ শুরু হলে অন্য শহরের সৈন্যরা ঐ পথ দিয়ে প্রবেশ করতো। তাদের অবস্থান ও কথাবার্তার সংবাদ ঐ পাহারাদার প্রশাসকের কাছে নিয়ে আসতো। একদা ঐ পাহারাদার গাছের উপরের দিকে ফাঁকাতে অবস্থান করছিলো। সে মজা করে গ্রামের এক লোককে বলছিলো : 'আমি হলাম উদ্দেশ্য পূরণের গাছ।' গ্রামের সহজ সরল লোকটি তা বিশ্বাস করলো এবং তার মানত ও হাদিয়া গাছের ছিদ্রের ভেতরে দিলো এবং কাকতালীয়ভাবে তার মনোবাসনা পূর্ণ হলো। গ্রামের ঐ লোক অন্যদের কাছে ঐ ঘটনা বললো। তারাও বিশ্বাস করলো। তারা গাছের মধ্যে হাদিয়া দিতে আরম্ভ করলো আর গাছের মধ্যে যে পাহারাদাররা অবস্থান করছিলো তারা দেখলো ভালোই তো ব্যবসা হচ্ছে। তারা এভাবে টাকা-পয়সা গ্রহণ করতে লাগলো আর কথা বলতে থাকলো। কিছুকাল পরে একদল ধোঁকাবাজ প্রকৃতির লোক মানুষদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এটাকে পেশা হিসেবে নিলো এবং পয়সা কামাতে থাকলো। কেননা, গাছের মধ্যের এই অবস্থান এবং মাটির ভেতরের সুড়ঙ্গের কথা কেউ জানতো না। তারা মনে করলো এটি খুবই পবিত্র গাছ– যে গাছ তাদের প্রতি সদয় হয়েছে। তাই তারা তাদের মনের কথা গাছের কাছে বলতো। কখনো বা তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হতো। কেউ আবার নিজেদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য এ গাছকে ব্যবহার করতো। লোকেরা গাছের উপাসনা করাকে অভ্যাসে পরিণত করলো। তরুণরা বৃদ্ধদের কাছ থেকে, ছেলে পিতার কাছ থেকে দেখে দেখে অভ্যস্ত হতে হতে এ অবস্থায় পৌঁছেছে। এটা হলো উদ্দেশ্য পূরণের গাছের রহস্য।

পর্যটক বললেন : 'তা হলে প্রথম রাতে কেন আমাকে স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার ওয়াদা করলো? পরবর্তীতে আবার ভয় দেখালো!'

মুরশিদ বললেন : 'এর কারণ হলো ঐ রাতে কেউ চায়নি যে, কেউ গাছের কোনো ক্ষতি করুক। ঠগগুলো কিছুটা অস্বস্তিতে ছিলো। রাতে অপমানিত হওয়ার ভয় পেয়েছিলো এবং তাদের ব্যবসায় ভাটা পড়ার আশংকা করছিলো। এজন্য তোমাকে স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। পরবর্তীতে লোকেরা সেখানে গেলে গাছ তাদেরকে বললো : 'আমার সাথে কেউ একজন দুশমনি করছে। সে রাতে এসে আমাকে অসম্মান করে।' পরবর্তী রাতে কয়েকজন লোক ওখানে পাহারা দিচ্ছিল। এরপর যেহেতু তাদের আর অপমানিত হবার ভয় ছিলো না, তাই তারা আর স্বর্ণমুদ্রা দেয়নি। যদি তুমি এ ব্যাপারে কোনো কথা বলতে, তা হলে যারা গাছকে অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে তারা তোমাকে মেরে ফেলতো।' পর্যটক বললেন : 'এখন বুঝলাম কেন কেউ শহরের লোকজনের কাছে এ খবর পৌঁছায় না এবং গাছকে কোনো প্রকার অপমান করে না।'

মুরশিদ বললেন : 'ঐ শহরের লোকেরা নির্বোধ। তারা খুব সহজে বিশ্বাস করে ঐ বৃক্ষ পূজাকে অভ্যাসে পরিণত করেছিলো এবং তারা অন্যদেরকে বিধর্মী ও গাছের দুশমন মনে করে। যদি কেউ গাছের সাথে শত্রুতা করার জন্য ওখানে যায়, তা হলে তাকে শহরের প্রশাসকের সাথে লড়াই করতে হবে। কেননা, সে নিজেই এখন ঐ উদ্দেশ্য পূরণ গাছের মালিক।'

পর্যটক আর কোনো কথা বললেন না। মূর্তিপূজকদের রহস্য বুঝতে পারলেন। এরপর তিনি অন্য কোনো অজানা শহরে ভ্রমণের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন।

মহানবী (সা.)-এর দয়া ও অনুগ্রহ

আলী যোহারী

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে ভালোবাসা, দয়া ও মমত্ববোধের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি নিজেই সবচেয়ে দয়ালু, মমতাময় ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তি ছিলেন। পবিত্র কুরআন মাজীদে তাঁর দয়ার্দ্র ও কোমল স্বভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে : '(হে রাসূল!) আল্লাহর পক্ষ থেকে এ এক অনুগ্রহ যে, তুমি তাদের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হয়েছ। যদি তুমি রুক্ষ মেজাজ ও কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে অবশ্যই তারা তোমার চারপাশ থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত।'– সূরা আলে ইমরান : ১৫৯

এরূপ অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর দয়া ও কোমলতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। দুর্বল ও দরিদ্রের প্রতি তিনি বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন। হযরত আনাস যিনি রাসূলের একজন খাদেম হিসেবে ছিলেন তিনি বলেন : "আমি আল্লাহর রাসূলের সেবায় দশ বছর নিয়োজিত ছিলাম। তিনি কখনই আমাকে ভর্ৎসনা করেননি কিংবা এটিও বলেননি : 'তুমি কেন এমন কাজ করেছ?' অথবা 'তুমি কেন এমন কাজ করনি?'"– বুখারী

একবার মহানবী (সা.) তাঁর স্ত্রী হযরত আয়েশাকে বলেন : 'হে আয়েশা! কখনই কোনো অভাবী লোককে বাড়ির দরজা থেকে খালি হাতে বিদায় করবে না। হে আয়েশা! গরিবদেরকে ভালোবাসবে; তাদেরকে তোমার নিকটবর্তী করবে; তা হলে পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ তোমাকে তাঁর নিকটবর্তী করবেন।'

মহান আল্লাহ অতি দয়াশীল। আর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর বান্দাদেরকে এবং ধর্ম, বর্ণ বা জাতি নির্বিশেষে সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে মহান আল্লাহর দয়াশীলতার গুণের পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন : 'মহান আল্লাহ দয়ালু এবং সকল কিছুতেই তিনি দয়া পছন্দ করেন।'– বুখারী

মক্কাবাসীদের পাপে নিমজ্জিত হয়ে পড়া ও আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করায় রাসূলের হৃদয় ব্যথিত হয়েছিল। পবিত্র কুরআনের আয়াত এর সাক্ষ্য প্রদান করছে। বলা হয়েছে : 'হয়ত তুমি নিজের প্রাণ বিনাশ করে ফেলবে এজন্য যে, তারা কেন বিশ্বাসী হচ্ছে না।'– সূরা শুআরা : ৩

আবার সূরা কাহফ-এ আমরা রাসূলের অবস্থা সম্পর্কে পড়ছি : 'তারা যদি এ বাণী বিশ্বাস না করে, তবে হয় ত তুমি তীব্র মনোকষ্টে তাদের পশ্চাতে প্রাণাতিপাত করবে।'– সূরা কাহফ : ৬

আর সূরা ফাতির-এ বলা হয়েছে– '...অতএব, তুমি আক্ষেপ করে তাদের পশ্চাতে প্রাণপাত কর না।'– সূরা ফাতির : ৮

প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা.) সকল মানুষের কল্যাণের জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং মানুষের বিপদ-আপদে ভীষণভাবে সহমর্মি হতেন। তিনি মহান আল্লাহর গুণাবলির পূর্ণতার প্রকাশস্থল ছিলেন। একজন মানুষের পক্ষে সর্বোচ্চ যতটুকু আল্লাহর গুণাবলি অর্জন করা সম্ভব, তিনি তার প্রতিফলন দেখিয়েছেন।

দয়া ও অনুগ্রহ মহান আল্লাহর একটি বৈশিষ্ট্য, যার কোনো সীমা নেই। এটি ব্যাপক এবং সকল কিছুকে কোনো ধরনের বিবেচনা ছাড়াই পরিবেষ্টন করে আছে। মহানবী (সা.)-এর দয়াও ছিল অপরিসীম। তিনি তাঁর দয়াকে প্রাণবন্ত ও প্রাণহীন সকল কিছুর জন্য বিস্তৃত করেছিলেন এবং বাছ-বিচারহীনভাবে সকলের উপকার করেছেন। তিনি সকল কিছুতেই তাঁর লাভ-ক্ষতি বিবেচনা ছাড়াই দয়া প্রদর্শন করেছেন। রাসূলের দয়ার ক্ষেত্রে কুরআনের ব্যবহৃত শব্দ 'রাউফুর রাহীম' (সূরা তওবা : ১২৮) অর্থের দিক থেকে প্রগাঢ় ও ব্যাপক যা মানুষের প্রতি মহানবী (সা.)-এর দয়ার সত্যিকার প্রকৃতি ও ব্যাপকতাকে তুলে ধরে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : 'একজন মানুষের জন্য দয়া প্রদর্শনের সুন্দরতম উপায় হলো তার পিতার মৃত্যুর পর পিতার বন্ধুদের সাথে দয়ার্দ্র আচরণ করা।'– আবু দাউদ

উত্তম আচরণের বিষয়টি আত্মীয়তার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়। হাদীসে বলা হয়েছে : 'যে ব্যক্তি চায় তার রুজি বৃদ্ধি হোক এবং তার আয়ু দীর্ঘ হোক তার উচিত তার আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণ করা।'– বুখারী

মহানবী (সা.) এ সকল বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এ কারণে যে, তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শুধু মায়া-মমতাই আয়ু বৃদ্ধি করে এবং কোনো ব্যক্তি তার দোষ-ত্রুটির কারণে রুজি থেকে বঞ্চিত হয়।– ইবনে মাজাহ

বাহায বিন হাকিম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদা রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কার প্রতি তাঁর দয়া প্রদর্শন করা উচিত। রাসূল (সা.) জবাব দিয়েছিলেন : 'তোমার মা।' তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তারপর কার প্রতি। রাসূল আবার বলেছিলেন : 'তোমার মা।' তিনি আবারও প্রশ্ন করেন, এরপর কার প্রতি। রাসূল (সা.) একই উত্তর দেন : 'তোমার মা।' এরপর তিনি রাসূলকে আবারও প্রশ্ন করেন, এরপর কার প্রতি। তখন রাসূল (সা.) জবাব দেন : 'তোমার পিতা এবং এরপরে তোমার আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা অনুসারে।'– আবু দাউদ

অনাথদের সাথে মানবিক আচরণ করা প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন : 'মুসলমানদের বাড়িগুলোর মধ্যে ঐ বাড়ি সর্বোত্তম যেখানে কোনো অনাথ থাকে এবং তার সাথে সদাচরণ করা হয় এবং মুসলমানদের ঐ বাড়ি সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে বাড়িতে একজন অনাথ থাকে এবং তার সাথে খারাপ আচরণ করা হয়।'– ইবনে মাজাহ

এর অর্থ এই যে, রাসূল (সা.) তাঁর অনুসারীদেরকে যে কোনো ব্যক্তির সাথে তার অবস্থান ও মর্যাদা নির্বিশেষে খারাপ ব্যবহার করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। বন্ধু থেকে আত্মীয়-স্বজন এবং আত্মীয়-স্বজন থেকে প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহারের পরিসীমা বিস্তৃত করে রাসূল (সা.) মানব জাতিকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল করতে চেয়েছেন যা তিনি গুরুত্বসহকারে এভাবে বলেছেন : 'সকল সৃষ্টিই আল্লাহর বান্দা এবং তারাই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় যারা তাঁর বান্দাদের সাথে দয়ার্দ্র আচরণ করে।'

রাসূল (সা.) তাঁর বাণীতে নারীদের সাথে সদাচরণের উপর বার বার গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন : 'নারীদের সাথে দয়ার্দ্র আচরণ কর, যেহেতু তারা তোমাদের সাহায্যকারী;... তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে, তেমনি তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে। তোমাদের অধিকার হলো তারা এমন কোনো ব্যক্তিকে তোমাদের বাড়িতে প্রবেশ করাবে না যাকে তোমরা অপছন্দ কর এবং তাদের অধিকার হলো তোমরা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে।'–

বিদায় হজ্বের ভাষণ থেকে

একদিন কয়েকজন নারী রাসূলের স্ত্রীগণের কাছে তাদের স্বামীদের দুর্ব্যবহারের ব্যাপারে অভিযোগ করে। এটি জানার পর রাসূল (সা.) বলেন : 'তোমাদের মধ্যকার এমন ব্যক্তি উত্তম নয়।'– আবু দাউদ

রাসূল (সা.)-এর এই দোষারোপ করা দ্বারা বুঝা যায়, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নারীদের প্রতি নির্দয় ছিল তাদেরকে আল্লাহর বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-কে বলল : 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার আত্মীয়রা এমন যে, আমি তাদের সাথে সহযোগিতা করলেও তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছেদ করে। আমি তাদের প্রতি দয়াশীল, কিন্তু তারা আমার সাথে মন্দ আচরণ করে।' রাসূল (সা.) এর জবাবে বললেন : 'যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এমন আচরণ বজায় রাখবে ততক্ষণ আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন এবং তিনি তোমাকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।'– মুসলিম

এমন বাণী শুধু একজন চিন্তাক্লিষ্ট মানুষের মনে প্রশান্তিই আনে না, বরং এটি মহানবী (সা.)-এর মানুষকে নিশ্চিত করার ব্যাপারে যোগাযোগের একটি কৌশল, যাতে যে কোনো মানুষই নিজেকে এ অবস্থায় দেখতে পায়, সে যেন আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয় যাতে সে সান্ত্বনা পায় ও নিরাপত্তা বোধ করে। তাই এ ধরনের সমস্যায় পতিত লোকদেরকে প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়ার উপদেশ দেয়া সঠিক নয়। সত্যিই হযরত মুহাম্মাদ (সা.) চমৎকার ও অতুলনীয় পরামর্শদানকারী ছিলেন।

মহানবী (সা.) নারী-পুরুষ, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলকে সুপরামর্শ দান করতেন। একদিন হযরত আসমা বিনতে আবু বকরের মা, যিনি তখনও অবিশ্বাসী ছিলেন, তাঁর কন্যাকে দেখতে মদিনাতে আসেন। আসমা রাসূলকে এটি অবহিত করেন এবং বলেন : 'আমার মা আমাকে দেখতে এসেছেন এবং তিনি আমার নিকট থেকে কিছু আশা করছেন। আমি কি তাঁকে মান্য করব?' রাসূল (সা.) বলেন : 'হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের প্রতি মমতাশীল হও।'– মুসলিম

রাসূল (সা.)-এর এই মনোভাব দেখা যায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যায়নাব আস সাকাফিয়ার ক্ষেত্রেও, যিনি একজন আনসারী ছিলেন। একদিন তিনি রাসূল (সা.)-এর কাছে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে যান। তিনি রাসূলকে বলেন, যদি তাঁরা তাঁদের স্বামীদের জন্য ও তাঁদের অধীনে যে সকল অনাথ রয়েছে, তাদের জন্য কিছু ব্যয় করেন সেগুলো কি দান হিসেবে গণ্য হবে? রাসূল (সা.) বললেন : 'তারা দ্বিগুণ সওয়াব পাবে; একটি আত্মীয়দের প্রতি দয়ার্দ্র হবার কারণে ও অপরটি দানের কারণে।'– বুখারী

পশু, পাখি ও পোকামাকড়ের প্রতি মহানবীর দয়া প্রদর্শনের বিষয়েও অনেক হাদিস রয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন : 'আল্লাহ সকল কিছুর উপরেই দয়া করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন; তাই যখনই তুমি কোনো প্রাণীকে যবেহ কর তখন ভালোভাবে যবেহ করো। যখন কুরবানি কর তখন উত্তমভাবে কুরবানি করো। প্রত্যেকে যেন যবেহ করার অস্ত্রকে ঠিকমতো ধার করে নেয় যাতে তা প্রাণীটির জন্য সহজ হয়ে যায়।'– মুসলিম

তিনি এমন বাণী দ্বারা মানুষ ও প্রাণী উভয়ের প্রতিই তাঁর ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন। রাসূল (সা.) তাঁর অনুসারীদের বুঝিয়েছেন যে, তিনিও তাদের ব্যথা অনুভব করেন।

অনুবাদ : সরকার ওয়াসি আহমদ

যে বিড়াল ইঁদুর ধরতে পারে না

বিএম বরকতউল্লাহ

ইঁদুর দেখলেই সে ধড়ফড়িয়ে ওঠে। কান খাড়া করে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে, মনে হবে ইঁদুরের আর রক্ষে নেই। ইঁদুরেরা দৌড়ে কোথায় যায়, কী করে মাথা কাৎ করে, সবই দেখবে সে। দেখতে দেখতে সে ঘুমিয়ে পড়বে। নাকডাকা ঘুম।

অলসের হদ্দ। খাওয়া আর ঘুম। শরীরের ওজন বেশি, নড়ে-চড়ে কম। সে যখন ঘুমায়, দেখে মনে হয় একটি বালিশ পড়ে আছে। এই শরীর নিয়ে ইঁদুর ধরা? অসম্ভব।

দিনে দিনে ইঁদুরের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ঘরে-বাইরে ইঁদুরের উৎপাতে আমরা অস্থির। অথচ ঘরে দিব্যি একটি বিড়াল আছে! খায়-দায়-ঘুমায়।

মাঝে মধ্যে দেখি, সে ইঁদুরের পিছে ছোটে। ইঁদুর গর্তে ঢুকে গেলে বিড়ালটি অলস ভাবে বসে থাকে গর্তের কিনারে।

আজব কারবার! বিড়ালের সামনে দাঁড়িয়ে একটি ইঁদুর কাঁদছে। বিড়ালটি একটু নড়াচড়া করলে ইঁদুরের কান্নার জোর বেড়ে যায়। কতক্ষণ কান্নাকাটি শোনার পর বিড়াল মন খারাপ করে ফিরে এসে সোফায় শুয়ে পড়ে। দেখা যায়, বিড়ালের চোখেও পানি টলমল করছে। ছিঁচকাদুনে ইঁদুরের কান্নায় ভেঙে পড়ে বিড়ালটি। তার আবার ইঁদুর ধরা!

যে বিড়াল ইঁদুর ধরতে পারে না, তাকে দিয়ে আর কাজ নেই।

ঘরে বিড়াল থাকবে আবার সারারাত ইঁদুরের উৎপাত সহ্য করব, এ হয় না। অতএব, ওকে তাড়াও।

দুই.

যেই কথা সেই কাজ।

একটি চটের ব্যাগে বিড়ালটিকে রাখলাম। বিড়ালের মধ্যে কোনো ভয় বা চিন্তার লেশমাত্র নেই। আমি যেভাবে ওকে ব্যাগের ভেতরে রাখলাম, ঠিক সেভাবেই চুপ করে শুয়ে রইল সে। কিছু দূর যাওয়ার পর ব্যাগের মুখ খুলে দেখি, নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে।

বাহ কি চমৎকার বিড়াল! মনে হচ্ছে তিনি শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছেন! এবার শ্বশুর বাড়ি গিয়ে আরামে শুয়ে বসে খাও গে, বিড় বিড় করে বললাম আমি।

আমি বনের ভেতরে ঢুকে একটি নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বসলাম। ঘন ঘাসের উপর ব্যাগটা কাৎ করে রাখলাম।

বিড়ালটি ব্যাগ থেকে বের হয়ে পিঠ বাঁকা করে বুক ডন দিয়ে হাই তুলল। আমি আঙুল খাড়া করে বললাম, খালি ঘুম আর খাওয়া। এবার বনের ভেতরে ফড়িং ধরে খাও, দেখি কেমন পারো তুমি! সে আমার দিকে তাকিয়ে একবার মিঁউ করল। মনে হলো সে আমাকে বিদায় জানালো। আমি হন হন করে চলে এলাম।

তিন.

এক অলস বিকেলে উঠোনে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। আমার মেয়ে সুমু হঠাৎ চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল। আব্বু দেখো, দেখো, আমাদের বিড়াল চলে এসেছে, বলে সে আনন্দে ছটফট করতে লাগল।

আচানক কারবার! বিড়ালটি ছুটে আসছে আমাদের দিকে। তার মুখে একটা ইঁদুর।

বিস্কিট দৌড় খেলায় মুখে বিস্কিট নিয়ে আসা প্রথম শিশুটিকে যেভাবে বরণ করে নেওয়া হয়; আমরা বিড়ালটিকে সেভাবেই হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিলাম। খুশিতে সকলের মুখ চিকচিক করে উঠলো।

ছড়া-কবিতা

আহলে বাইত্
আবদুল মুকীত চৌধুরী

পবিত্র আহলে বাইত্ নবী পরিবার
মুহাম্মদ নবীশ্রেষ্ঠ রাসূলুল্লাহ্‌র
কুরাইশী বংশক্রমে একান্ত স্বজন
আলী ও ফাতেমা সূত্রে পুত্র-পরিজন
হাসান হুসাইন সহ পাঞ্জতন পাক
চরিত্র উদ্ভাসিত শ্রেষ্ঠ আখলাক;
আদর্শ জীবন তাঁরা কুরআন সুন্নাহ্‌র
আল্লাহ্‌র সালামপ্রাপ্ত নবী মুস্তাফার।

নবী পরিবার নিয়ে ইচ্ছা আল্লাহ্‌র:
চান তিনি দূর করতে অশুচিতা, আর
পূর্ণ পবিত্র করতে তিনি চান তাঁদের,
আয়াতক্রম তেত্রিশ সূরা আহযাবের
আহলে বাইত্ সম্পর্কে ইচ্ছা আল্লাহ্‌র
এ গোটা সৃষ্টির জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার।

হযরত উম্মে সালামা উম্মে মুমীন
নবীপত্নী মর্যাদা রাবীয়ে দীন।
একাত্ম রাসূল সাথে উম্মে সালামার
সূত্রে পাওয়া এ হাদীস শুদ্ধ বর্ণনার–
বলেন মুমীন-মাতা : সে আমারি ঘর
পবিত্রতার আয়াত (আল্লাহ্‌র স্বর)
অবতীর্ণ হলো (মহানবীর ওপর),
এক চাদরে নিয়ে রাসূল তখন
আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসেন স্বজন
দু'আ করেন : "হে আল্লাহ্, এরাই আমার
আহলে বাইত্ আপন, ওগো পরওয়ার
সব অসুবিধা থেকে এদেরকে দূরে
রাখো", (হে মওলা, তোমার নূরে)।
উম্মে সালামার প্রশ্ন : "আল্লাহ্‌র রাসূল"
(পরম একাত্মতা জিজ্ঞাসার মূল)
"আমিও আসতে পারি চাদর ভেতর ?"
"না, তুমি তো রয়েছোই ফালাহের 'পর।"
রাসূল জবাব দেন ঋজু স্পষ্টতার,
নেই অবকাশ এতে সংযোজন কার,
আহলে বাইত্ রাসূলের পাক পাঞ্জতন
পবিত্র বংশধারা–রক্তের বন্ধন।

তেত্রিশতম সূরা : আয়াত তেত্রিশ
কালামে ইলাহীতে বাণী অহর্নিশ
পবিত্রতা ঘোষণায় রবেই সোচ্চার
অনন্য 'মাহাত্ম্যে' আহলে বাইত্ মুস্তাফার।

আল্লাহ্‌র কালামের সূরা শুরার
তেইশতম আয়াতে সংবাদ তাঁর,
বান্দাদের খুশখবর বার্তা আল্লাহ্‌র
ঈমান আনে যারা সৎকর্ম আর
রিসালাত বিনিময়ে নেই চাওয়ার
অন্য কোন প্রতিদান নয় মুস্তাফার,
সৌহার্দ্য আত্মীয়ের ছাড়া কিছু নয়,
নৈকট্যের পাঞ্জতন ঈপ্সিত হয়।
পবিত্র পঞ্চস্তম্ভে ইমারত এই–
হুসাইনের পতাকার বিকল্প নেই
আদল ইনসাফ প্রতীক শহীদ ইমাম,
রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাঁর কালোত্তীর্ণ নাম।

সূরা হুদের তিয়াত্তর আয়াতে বর্ণন :
আহলে বাইত্ রাসূলের প্রিয় পরিজন
তাঁদের ওপর বিশেষ রহমত আল্লাহ্‌র
এবং রয়েছে চির অনুগ্রহ তাঁর।

বিদায় হজ্জ রাসূলের ফেরার ভাষণ–
সাহাবা-সমুদ্রে স্পষ্ট সেই উচ্চারণ
মানব জাতির প্রতি সতর্ক বার্তার
রেখে যাচ্ছেন নবী আঁকড়ে থাকার
দুই বস্তু : কুরআন ও ইতরাত তাঁর
আহলে বাইত্ (পবিত্র নবী পরিবার)
শক্তভাবে এ উভয় করলে ধারণ
ভ্রষ্টতার বিচ্যুতিতে নয় নিমজ্জন,
মূলতঃ সুন্নাহ্ মূর্ত এই ইতরাতে
আদর্শের উৎস ও বাস্তবতা তাতে।

আহলে বাইত্ প্রসঙ্গে ইমাম শাফি'ঈর
ভাষণ আবেগ-ঋদ্ধ, আনুগত্যে স্থির :
"যদি রাফিযীই হতে হয় এ ভালবাসায়,
সাক্ষী থাক জিন-নর আমার কথায়,
আমিও রাফিযী"–এই দীপ্ত ঘোষণায়
বাইতের ভালবাসা শীর্ষ উচ্চতায়।

–পবিত্র ঈদ ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)
স্মরণিকা ১৪৪১ হিজরী/
১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
সুবহে সাদিক ১৪৪১ হিজরী/২০১৯ ঈসায়ী
বাংলাদেশ আন্‌জুমানে তালামীযে ইসলামিয়া।

আমার নবী
ইয়াকুব আলী রনী

আমার নবী প্রিয় নবী
আছেন মদীনাতে
রোজ হাশরে দেখা দেবেন
আছি তামান্নাতে।

নবীর হাদীস পড়ে আমি
হলাম অনেক খাঁটি
এই নবীকে কেউ না মানলে
তার জীবনই মাটি।

নবীর কথা মনে হলে
চোখে আসে পানি
এই সমাজে ছড়িয়ে দেই
মহানবীর বাণী।

বিচার দিনে শেষ ভরসা
প্রিয় রাসূলপাক
তাঁর দেখানো পথে চলে
গড়ি এ আখলাক।

কাশেম সোলাইমানি
সুজন পারভেজ

ওহে, হাজী কাশেম সোলাইমানি
ওহে, ইসলামের শহিদ
আমরা কখনোই ভুলবো না
তোমার জীবন দান।
ইরান হতে ইরাক ও সিরিয়া
এখনো অনুভব করি
তোমার পথ চলার শব্দ।
কেরমান থেকে
কারবালা ও ফোরাত পর্যন্ত
শুনি তোমার স্লোগান ও আদেশ
জেগে ওঠো, হে মুসলিমরা
কাঁধে কাঁধ ও হাতে হাত মিলিয়ে।
পারস্য উপসাগর হতে
ভারত মহাসাগর পর্যন্ত
সবখানে তোমার গুণগান
তোমার জীবন দান
বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য
তোমার স্থান
বিশ্বের সকল মুসলমানের হৃদয়ে
তোমার জীবন দান
কখনোই বৃথা যাবে না।